ইসলামে
পারিবারিক ভারসাম্য

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

সফর-১৪৩৮ হিজরী

নভেম্বর-২০১৭ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

bestkitab.weebly.com
almunirabdullah@gmail.com

মূল্যঃ ৮০ টাকা।

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যার যার আমানত তার নিকট পৌছে দেওয়ার জন্য। [নিসা/৫৮]

ইবনে কাছির ﵀ বলেন,

وَهَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ، مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى عِبَادِهِ، مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالصِّيَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ..... وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

এই আয়াতে এমন সকল দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের উপর ফরজ। তা হতে পারে আল্লাহর হক। যেমন, নামায, যাকাত, কাফফারা, মানত, রোজা ইত্যাদি। অথবা হতে পারে একজন বান্দার উপর অন্য বান্দার হক। [তাফসীরে ইবনে কাছির]

অর্থাৎ এই আয়াতে আমাদের আদেশ করা হয়েছে যার যা পাওনা বা অধিকার তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। অন্য একটি হাদীসে একই কথা বলা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

তোমার উপর তোমার রবের কিছু হক রয়েছে, তোমার নিজেরও কিছু হক রয়েছে, তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব, প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে আদায় কর। [সহীহ বুখারী]

অন্য হাদীসে এসেছে, (وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) "তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে।" [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

এইসব আয়াত ও হাদীসে নানাপ্রকার হক বা অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে

যার যা হক সুচারুভাবে তা আদায় করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। যার যা দায়িত্ব সে সম্পর্কে (আখিরাতে) তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। একজন শাসক প্রজাদের উপর দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে । একজন পুরুষ তার পরিবারের সদস্যদের উপর দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জবাবদিহিতা করতে হবে। একজন মহিলা তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল। সে ব্যাপারে তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। একজন সেবক তার মনিবের (বিভিন্ন কর্মকান্ডে) দায়িত্বশীল। সে সম্পর্কে তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

এসব আয়াত ও হাদীসে যে দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পন করা হয়েছে এবং তা পালনে অবহেলা করলে আখিরাতে যে কঠোর জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়ার কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে চিন্তা করলে যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু এটা অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। সাধারণভাবে মানুষ নিজের খেয়াল খুশি মত কোনো একজন বা কোনো এক পক্ষের অধিকার আদায় করতে অভ্যস্ত এবং অন্য আরেকজনের অধিকার হরন করতে সিদ্ধহস্ত। কেউ হয়তো স্ত্রী-সন্তানের দায়িত্ব পালন করছে কিন্তু বাবা-মায়ের পাতে দু বেলা দু মুঠো ভাত পর্যন্ত দিচ্ছে না। বিপরীতে একদল লোক বাবা-মায়ের অধিকার আদায় করার নামে স্ত্রীর সাথে দাস-দাসীদের মত আচরণ করছে। নিজের কাজ তো বটেই এমনকি বাবা-মা ভাই-বোন বা দুঃসম্পর্কের আত্মীয়দের রান্না-বাড়া করা, কাপড়-চোপড় কাচা বা ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে পর্যন্ত তারা নিজ স্ত্রীকে ব্যবহার করে। সেই সাথে মা-বোনের হাতে চলছে স্ত্রীর লাঞ্চনা-গঞ্জনা। স্বামীর সাথে সখ আহলাদ করা তো দূরের কথা পেট ভরে ভাত পর্যন্ত খেতে পায় না তারা। স্ত্রীর হকের ব্যাপারে পরিপুর্ণ অজ্ঞ থাকার কারণে এবং হুজুরদের মুখে এক তরফাভাবে কেবলই মা-বাবার অধিকার সম্পর্কে বয়ান শুনার কারণে এসব স্বামীদের অনেকেই দ্বীনদার হওয়া সত্বেও মুখবুজে এসব জুলুম সহ্য করে। সে স্ত্রীর উপর দায়িত্বশীল ছিলো এবং এই দায়িত্ব সম্পর্কে আখিরাতে তাকে

জবাদিহিতা করতে হবে সেটা বেমালুম ভুলে যায়। স্ত্রীকে মা-বাবার হাতে ছেড়ে দেয় যেমন খুশি আচরণ করার জন্য। কখনও বা বাবা-মার প্ররোচনায় নিজেও অকারণে স্ত্রীকে মারধর করে। এমনি যুলুম নির্যাতনের পরিপেক্ষিতে স্ত্রীর বাবা-মা অর্থকড়ি বা মটরগাড়ি দিতে বাধ্য হলে এসব বুজুর্গরা মনের আনন্দে সে গুলো ব্যবহার করে। কৃত জুলুমের কারণে না অনুতপ্ত হয় আর না এসব কারণে আখিরাতে অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হয়। অথচ যুলুম সম্পর্কে কুরআন হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন, (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) “তোমারাও কারও উপর জুলুম করবে না আবার তোমাদের উপরও যেন কেউ জুলুম করতে না পারে।” [বাকারা/২৭৯]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তোমরা কারও উপর যুলুম করা থেকে বেচে থাকো। কেননা কেয়ামতের দিন জুলুম হবে জুলুমাত (অন্ধকার)। [বুখারী ও মুসলিম]

যাকাত আদায়ের সময় বেছে বেছে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ গ্রহন করার ব্যাপারে সতর্ক করে রসুলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায়কারীদের বলতেন,

فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

তুমি (যাকাতের নামে) মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ ছিনিয়ে নিও না। মাযলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা আল্লাহর সাথে তার কোনো পর্দা থাকে না। (অর্থাৎ দ্রুত কবুল হয়।) [সহীহ বুখারী]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, (فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ) “কেননা মাযলুমের দোয়া আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কবুল হয়।”

দেখা যাচ্ছে, যাকাতের মত গুরুত্বপুর্ন একটি ইবাদত আদায়ের নামে মানুষের উপর সামান্য জুলুম করা হলেও তার পরিনতি অতি ভয়াবহ। তাহলে বাবা-মায়ের হক আদায়ের নামে স্ত্রীর উপর জুলুম করা কিভাবে গ্রহনযোগ্য হতে পারে। সত্য কথা হলো, স্ত্রী-সন্তার পালন করার নামে বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যেমন অপরাধ বাবা-মায়ের অধিকার আদায় করার নামে স্ত্রীর অধিকার হরন করাও অপরাধ। উভয়

অপরাধের মাত্রা কমবেশি হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর দরবাবে দুটিই ঘৃনিত। যেহেতু জুলুমকে তিনি কোনো ভাবেই বৈধ করেননি। নিজে জুলুম করা তো দুরের কথা সামনে কারও জুলুম হতে দেখে নিরবে বসে থাকা বা জুলুম করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়াও ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। বরং মুসলিমের দায়িত্ব হলো জালিমকে প্রতিহত করা, সে যেই হোক না কেনো। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তাকে সে (নিজেও) জুলুম করে না। অন্য কারও হাতে (জুলুম করার জন্য) ছেড়েও দেয় না। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) "তোমার মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করো। সে জালেম হোক বা মাজলুম হোক।" সাহাবার বললেন, (إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ) "যে জালেম তাকে কিভাবে সাহায্য করব?" রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ) "তাকে জুলুমে বাধা দেবে।" [সহীহ বুখারী]

প্রিয়তমা স্ত্রী বাবা-মায়ের উপর জুলুম করলে বা শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা স্ত্রীর উপর জুলুম করলে কি করা উচিত বুদ্ধিমান ব্যাক্তিমাত্র এই হাদীসের আলোকে বুঝে নিতে পারবেন বলে আশা করি। স্ত্রীর ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে যারা বাবা-মায়ের খোজখবর নেয় না আশা করি তারা তওবা করে ফিরে আসবে। সেই সাথে যেসব বুযুর্গরা বাবা-মায়ের অধিকার আদায়ের নামে স্ত্রীর উপর জুলুম করেন বা জুলুম করার জন্য বাবা মায়ের হাতে ছেড়ে দেন আশা করি এ হাদীস জানার পর তারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবেন। হয়তো তারা এ ধরনের জুলুম থেকে বিরত হবেন এবং যার যা হক সুচারুভাবে তা আদায় করবেন। অন্যথায় কেয়মাতের দিন তাদের নিকট থেকে এ হক আদায় করা হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

তোমরা (যে সব হক দুনিয়াতে আদায় করো নি) কেয়ামতের দিন তা আদায় করতে বাধ্য হবে। এমনকি শিংওয়ালা ছাগলের কাছ থেকে (অন্যায় ভাবে গুতো মারার কারণে) শিংবিহীন ছাগলের হক আদায় করে দেওয়া হবে। [সহীহ মুসলিম]

দেখা যাচ্ছে, অবলা যন্তুরা অন্য সকল হিসাব নিকাশে ছাড় পেলেও জুলুমের হিসাব

থেকে তারাও মুক্ত নয়। অন্য হাদীসে এসছে,

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ

পুলসিরাত পার হওয়ার পর মুমিনদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি সেতুর উপর দাড় করিয়ে দুনিয়াতে তারা একে অপরের প্রতি যে জুলুম করেছ তা (সওয়াবের ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে) আদায় করে দেওয়া হবে। এভাবে তারা যখন পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

[সহীহ বুখারী]

অর্থাৎ ভালো আমলের কারণে জান্নাত পাওয়ার যোগ্য এমন বুযুর্গ ব্যাক্তিও কারও উপর জুলুম করলে জান্নাতে প্রবেশের আগে তার নিকট থেকে সওয়ার ছিনিয়ে নিয়ে মাজলুমকে প্রদান করার মাধ্যমে জুলুমের বিচার সম্পন্ন করা হবে। এ থেকে বুঝা যায়, আপনার মা আপরনার স্ত্রীর থেকে যতটাই বেশি সম্মানিত হোক তার উপর জুলুম করা অধিকার তার নেই। মা জুলুম করলে মুখ বুজে সেটা সহ্য করার বৈধতাও আপনার নেই। বরং আপনার দায়িত্ব হলো মায়ের হক মাকে বুঝিয়ে দেওয়া আর স্ত্রীর হক স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেওয়া। কারও ব্যাপারেই কোনো কমতি না করা। এ সব হককেই মহান আল্লাহ আমানত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তা যথাযথভাবে আদায় করা নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ ভাবতে পারে, এভাবে সবার হক আদায় করা তো কঠিন ব্যাপার। সত্যি বলতে এটা আসলেই কঠিন। তাই তো মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

আমি এই আমানত আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়ের উপর অর্পন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করলো এবং ভিত সন্ত্রস্ত হলো। কিন্তু মানুষ তা বহন করতে সম্মত হলো। নিসন্দেহে সে জালেম ও জাহেল। [আহযাব/৭২]

দেখা যাচ্ছে, যে আমানতের ভার মানুষের উপরে অর্পন করা হয়েছে তা এতই কঠিন দায়িত্ব যে, আকাশ, পৃথিবী বা পাহাড় পর্যন্ত তা গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু মানুষ না বুঝে তা বহন করতে সম্মত হয়েছে। এখন তো তাকে তা পালন করতেই হবে, যদিও তা কষ্টকর হয়। অতএব, সে দায়িত্বকে সহজ করার জন্য ইচ্ছামত

কিছু আদায় করলাম আর কিছু পরিত্যাগ করলাম, কারও হক প্রদান করলাম আর কারও অধিকার হরন করলাম এমন নীতিতে চললে হবে না। বরং প্রত্যককে তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে হবে। যদিও তা কষ্টকর হয়। যেহেতু কষ্টকর বিষয় পরিত্যাগ করে কেবল সহজ বিষয়গুলো আদায় করার মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যাবে না। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। [মুসলিম]

অর্থাৎ জান্নাত পেতে হলে কষ্টকর দায়িত্বই পালন করতে হবে, এড়িয়ে গেলে হবে না। অতএব, সকলের হক আদায় করার যে আমানত মানুষের উপর অর্পন করা হয়েছে তা পালনে যত্নবান হতে হবে। এটা করতে হলে কার কি অধিকার সেটা উত্তমভাবে জানতে হবে। সেই সাথে এসব অধিকার সঠিকভাবে আদায় করার ব্যাপারে কি কি বাধার সৃষ্টি হয় সেটাও জেনে নিতে হবে এবং তা থেকে উত্তরনের চেষ্টা করতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকলের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই এখানে আমরা শুধুমাত্র পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করব। যেহেতু এটা পারিবারিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন বিষয় এবং একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। বিবাহের পর থেকেই বেশিরভাগ সংসারে এই উভয় প্রকার অধিকার নিয়ে টানাপোড়ান শুরু হয়। উপযুক্ত জ্ঞান না থাকার কারণে বেশিরভাগ মানুষই এক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ন আচরণ করতে ব্যর্থ হয়। কেউ ঝুকে পড়ে বাবা-মায়ের দিকে আবার কেউ ঝুকে পড়ে স্ত্রী-সন্তানের দিকে। এবাবে একটি পক্ষ একচেটিয়া অধিকার পেয়ে যায় আর অন্য পক্ষ বঞ্চিত হয়। এ কারণে প্রত্যকের উচিত এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তবে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পূর্বে সেই জ্ঞানের উপর আমল করার মানসিকতা তৈরী করা উচিত। এই মানসিকতা তৈরী করতে হলে কয়েকটি বাধা অতিক্রম করতে হবে। নিচে এসব বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হলো।

যেসব কারণে মানুষ অন্যের হক বিনষ্ট করে

১। গর্ব–অহংকার

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অহংকারী মানুষ নিজেকে বড় এবং অন্যকে ছোট মনে

করার কারণে নিজের হক পরিপূর্নভাবে আদায় করে নেই ঠিকই কিন্তু অন্যকে তার প্রাপ্য হক প্রদান করে না। ধনী ব্যাক্তি গরীবের হক স্বীকার করে না, শাসক প্রজার হক আদায় করেনা, স্ত্রীর কোনো হক আছে বলে স্বামী আদৌ মনে করে না। আর শাশুড়ী তো ছেলের বউকে মানুষই মনে করে না। বিপরীতে অনেক পুত্রবধু শাশুড়ীকে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হিসেবে গন্যই করেনা। এসবই হয় অহংকারের বশবর্তী হয়ে নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যকে ছোট মনে করার কারণে। এভাবেই গর্ব অহংকারের বশবর্তী হয়ে মানুষ যার যা হক আদায় করার মত গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বে অবহেলা করে থাকে। এদিকে ইঙ্গিত করে সুরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন প্রতিবেশি ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেওয়ার পর বলা হয়েছে (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) "যে গর্ব অহংকার করে আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না।" ইমাম বায়দাবী ﷺ বলেন, (مَنْ كَانَ مُخْتَالًا متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم) "অহংকারী বলতে বুঝায় যে তার আত্মীয় প্রতিবেশি ও সঙ্গী-সাথীদের উপর গর্ব করে তাদের (হক বা অধিকারের) দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।" [তাফসীরে বায়দাবী]

এই আয়াতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, অহংকারী ব্যাক্তি অন্যদের হক আদায়ে মনোযোগী হয় না। একটি হাদীসে অহংকারের এ ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যাক্তি প্রশ্ন করল, মানুষ তো সুন্দর পোশাক-আশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। এটাই কি অহংকার? উত্তরে রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ

আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং সুন্দর জিনিসই তার পছন্দ (অর্থাৎ এটা অহংকার নয়)। অহংকার হলো হক অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। [সহীহ মুসলিম]

মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এর ব্যাখ্যায় ইবনে রজব হাম্বলী ﵀ বলেন,

هُوَ احْتِقَارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النَّفْسِ بِعَيْنِ الْكَمَالِ، وَإِلَى غَيْرِهِ بِعَيْنِ النَّقْصِ

তা হলো, মানুষকে অবজ্ঞা করা এবং তাদের ছোট মনে করা। নিজেকে কামেল (ভুলত্রুটির উর্ধে) মনে করা আর অন্যদের নাকেছ (ত্রুটিপুর্ন) মনে করা।

[জামেউল উলুম]

বলা বাহুল্য যে, এমন অহংকারী ব্যাক্তি অন্যের হক সম্পর্কে যতই জ্ঞান অর্জন করুক অহংকারের কারণে তার পক্ষে তা আদায় করা সম্ভব হবে না। অতএব এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পুর্বেই তার উঠিত হবে এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা। অহংকারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে যে সব আয়াত ও হাদীস বর্ণিত আছে মনোযোগ সহকারে সেগুলো পাঠ করলে এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো রসুলুল্লাহ ﷺ এর বানী,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

যার অন্তরে অনু পরিমান অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [সহীহ মুসলিম]

এছাড়া কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অহংকারের বশবর্তী হয়ে হক পরিত্যাগ করা বা অন্যের হক আদায় করতে অস্বীকৃতি জানানোর কাহিনী বর্নিত আছে। এমন কাজের ভয়াবহ পরিনতির কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রশিদ্ধ হলো ইবলিস শয়তানের ঘটনা। মহান রব্বুল আলামিন তাকে আদম عليه السلام এর উদ্দেশ্যে সাজদা করার নির্দেশ দেন। এ হিসেবে এই সাজদাটি আদম عليه السلام এর হক ছিলো। কিন্তু সে এ হক আদায় করতে অস্বীকৃত জানায় এবং বলে,

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

“আমি তো তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।” [সুরা আরাফ/১২]

দেখা যাচ্ছে, নিজেকে বড় মনে করার কারণেই ইবলিস হককে অস্বীকার করে এবং আযাযিল থেকে শয়তানে পরিনত হয়।

রসুলুল্লাহ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে কাফের-মুশরিকরা বলতো,

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا

আল্লাহ কি এই ব্যাক্তিকেই রসুল করে পাঠালো! [সুরা ফুরকান/৪১]

অর্থাৎ তার চেয়ে অধিক ধনী বা অধিক সম্মানীত কোনো ব্যাক্তিকে কেনো রসুল হিসেবে পাঠানো হলো না। অন্য আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, তারা বলতো,

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

এ দুটি নগরীর (মক্কা বা তায়েফের) কোনো একজন সনামধন্য ব্যাক্তির উপর এই কুরআন কেনো অবতীর্ণ হলো না? [যুখরুফ/৩১]

দেখা যাচ্ছে, কাফের-মুশরিকরাও রসুলকে তুচ্ছ জ্ঞান করার কারণে তার উপর ঈমান আনয়ন করা থেকে বিরত থেকেছিলো। অর্থাৎ অহংকারই তাদের ধ্বংশ করেছিলো। তারা আশা করেছিলো, তাদের মধ্যে গন্যমান্য কোনো ব্যাক্তির উপর কুরআন অবতীর্ণ হোক। উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন,

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

কাকে রসুল করবেন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। [আনয়াম/১২৪]

এটাই হলো ইসলামের মুলনীতি। কার উপর কি দায়িত্ব অর্পন করা হবে এবং কাকে কি হক প্রদান করা হবে সেটা মহান আল্লাহ ঠিক করে দিবেন। আর আমাদের তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। মা-বাবা এমন বলতে পারবে না যে সারাটা কাল কোলেপিঠে করে যে ছেলেকে মানুষ করলাম বিয়ের পর সে স্ত্রীর হক কেনো আদায় করবে? স্ত্রীও এটা বলতে পারবে না যে, যার রান্নাবাড়া, কাপড়কাচা ইত্যাদি সকল কাজই আমি করি। সেই সাথে তাকে মানসিক প্রশান্তি দান করি। তার কামায়ের একমাত্র ভাগিদার আমিই। তাতে তার বাবা-মা, ভাই-বোনের কোনো অংশ নেই। এমনও বলতে পারে না যে, আমিও মানুষ আমার স্বামীও মানুষ। অতএব, কেনো সে আমার উপর কর্তৃত্ব করবে এবং আমি তার আনুগত্য করব। স্বামীও বলতে পারে না আমি যাকে খাওয়াই পরাই তার আবার কিসের এত হক যে তা আদায় করতে হবে? এসবই হবে শয়তানের "আমি তার চেয়ে উত্তম" এই কথার মত। অতএব এগুলো পরিহার করে প্রত্যকের উঠিত হবে অন্যের হক আদায়ে সচেষ্ট হওয়া।

২। লোক দেখানো বা সমাজ ঠেকানো

দ্বিতীয় যে কারণে মানুষ জেনে বুঝে হককে পরিত্যাগ করে তা হলো রিয়া (الرياء) তথা লোক দেখানো বা সুময়া (السمعة) তথা সমাজে দূর্নামের ভয়। বড় চাকুরি পেয়ে গরীবের ছেলে ধনী বনে গিয়ে ধনবানদের সমাজে মেশার পর নিজের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মান যাওয়ার ভয়ে আর বাবা-মায়ের পরিচয় দিতে চায় না। এমনকি তার ছেলে-মেয়ের বিয়েতেও বাবা-মা দাওয়াত পায় না। পেলেও বাড়ির এক কোণে লুকিয়ে রাখা হয়, পার্টিতে হাজির করা হয় না। বিপরীতে বিবাহের পর নিজের যৌতুক নেওয়ার ইচ্ছা না

থাকলেও বন্ধু বান্ধব বা এলাকার লোকের মুখে অন্যরা কে কি যৌতুক পেয়েছে সেটা শুনে এবং নিজে না পাওয়ার কারণে তাদের মুখে তিরষ্কার শুনে স্বামী-শাশুড়ী মিলে স্ত্রীর উপর নির্যাতন করা হয়। এসবই ঘটে লোক দেখানো বা সমাজ ঠেকানোর অজুহাতে। গায়ে হলুদ, বিবাহ, সন্তান জন্মানো ইত্যাদি নানা উপলক্ষ্যে সমাজ ঠেকানোর নামে স্ত্রী পক্ষকে বড় রকমের খানা-পিনা ও বিদায়-আদায় করতে কঠোর ভাবে বাধ্য করা হয়। সামাজিক প্রথায় যেসব অনুষ্ঠান বরের বাড়িতে হওয়া উচিত সেগুলোর খরচ খরচার কিছুটা বা পুরোটা মেয়ে পক্ষ বহন করতে বাধ্য হয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নামে বিয়ের পরে কয়েক মাস যাবৎ বর-কনে উভয়ের বাড়িতে চলে উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনদের হামলা। চলে খানা-পিনা ও শাড়ি-গয়নার আদান প্রদান। এতে একদিকে বরের পকেট যেমন ফাকা হয়, তেমনি মেয়ের বাবার সঞ্চিত টাকাও শেষ হয়ে যায়। এমন কি শেষে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই প্রথার কু প্রভাবে অনেক ছেলেই আধা বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করে কাটিয়ে দেয়। আর অনেক বাবাই মেয়ের বিয়ের বিষয়টি স্বযত্নে এড়িয়ে চলেন। এছাড়া সমাজ ঠেকানোর নামে বেপর্দা ও বেহায়াপনার আয়োজন তো বিয়ে বাড়িতে হরহামেশায় ঘটে। এ যুগের বুযুর্গ শ্রেনীও এসব কু প্রথা থেকে মুক্ত নন। বেপর্দা ও বেহায়াপনার বিষয়টি তারা এড়িয়ে গেলেও স্ত্রী ও শশুর বাড়ির উপর জুলুম নির্যাতনে মোটেও কমতি করেন না। অতি বুযুর্গীর কারণে মা-বাবার হক হয়তো আদায় করেন কিন্তু স্ত্রীর হক সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের উপর একেবারেই আমল করেন না। মা-বাবার জুলুম স্পষ্টভাবে প্রমানীত হওয়ার পরও স্ত্রীকে জুলুম থেকে বাচানোর জন্য পৃথক বাসস্থানের যে ব্যবস্থা ইসলাম স্বামীর উপর আবশ্যক করে স্ত্রীর এ হক আদায় করেন না। একটাই যুক্তি, সমাজের লোক বলবে অবাধ্য ছেলে। এভাবে লোক দেখানো ও সমাজ ঠোকানোর নামে পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে চলছে নানা রকম জুলুম নির্যাতন। অথচ সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট হলো (وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ) "তারা নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করে না।" [মায়েদা/৫৪] হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম রসুলুল্লাহ ﷺ এর হাতে বায়াত হওয়ার সময় ওয়াদা করতেন,

وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

আমরা সর্বাবস্থায় হকের উপর টিকে থাকবো বা হক কথা বলবো এবং আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবো না। [বুখারী ও মুসলিম]

সুতরাং সমাজের তালে গা ভাসিয়ে দেওয়া মোটেও বুযুর্গী নয়। বরং প্রকৃত বুযুর্গী হলো সমাজের সাথে সংগ্রাম করে হকের উপর টিকে থাকা। যে এটা করতে পারে সেই সফল হয় আর যে সমাজের কাছে আত্মসমর্পন করে সে ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ এর চাচা আবু তালিবের জীবনীতে যথেষ্ট শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। তিনি তার জীবদ্দশায় নানাভাবে রসুলুল্লাহ ﷺ কে সহায়তা করা সত্বেও ঈমান এনে মুসলিম হননি। এমনকি মৃত্যুশয্যায় যখন রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন আপনি কেবল কালিমা বলুন। আমি আপনার জন্য শাফায়াত করব। উত্তরে তিনি বলেন,

لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ

কুরাইশরা আমাকে নিন্দা করবে। বলবে, আমি অধৈর্য হয়ে (বাপ-দাদার ধর্মে টিকে না থেকে) ঈমান এনেছি। এমন না হলে আমি কালিমা পাঠ করে তোমার চক্ষু শীতল করতাম। [মুসলিম]

দেখা যাচ্ছে, পাছে লোকে কি বলে এই ভয়েই আবু তালিব রসুলুল্লাহ ﷺ এর চাচা হয়েও ঈমান কবুল করেননি। ফলে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হয়ে গেছেন। এই ঘটনা লোক দেখানো বা সমাজ ঠেকানোর নীতি কতটা ভয়াবহ পরিনতি ডেকে আনতে পারে তার পক্ষে প্রমাণ। অন্য একটি হাদীসেও এর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনজন ব্যাক্তি প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের একজন ছিলো আলেম ও আমলদার ব্যাক্তি, আরেকজন ছিলো দানশীল, অন্যজন আল্লাহর রাস্তায় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছিলো অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে সে শহীদ। তবে তারা এসব কাজ লোক দেখানোর জন্য করেছিলো। তাই আলেমকে বলা হবে, (إِنَّمَا كُنْتَ تُصَلِّي، لِيُقَالَ قَارِئٌ مُصَلٍّ، وَقَدْ قِيلَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ) "তুমি তো আমল করেছো ও কুরআন পাঠ করেছো যাতে তোমাকে নামাযী ও কারী (আলেম) বলা হয়। সেটা তো (দুনিয়াতে) বলাই হয়েছে। অতএব জাহান্নামে প্রবেশ কর।" এভাবে দানশীলকে বলা হবে তুমি দান করেছো যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যাক্তিকে বলা হবে তুমি যুদ্ধ করেছো যাতে তোমাকে লোকে বীর বলে। সেসব তো বলা হয়েছে। অতএব তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। [মুসতাদরাকে হাকেম] ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন ও ইমাম জাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকার কারণে ইলম, ইবাদত, দান ও জিহাদের

মত নেক আমলও কোনো কাজে আসছে না। উল্টো তা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হচ্ছে। তাহলে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে জুলুমের মত ভয়াবহ পাপে যে লিপ্ত হয় তার অবস্থা কি হতে পারে। এব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ

যে কেউ মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে আল্লাহ নিজেও তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, মানুষকেও তার উপর সন্তুষ্ট করে দেন। আর যে আল্লাহকে আসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে আল্লাহ নিজেও তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান অন্য মানুষকেও তার উপর রাগিয়ে দেন। [সহিহু ইবনে হিব্বান] হাদীসটি হাসান।

দেখা যাচ্ছে, লোক দেখানোর জন্য যে ভালো আমল করে সে আখিরাতে কোনো প্রতিদান না পেলেও দুনিয়াতে কিছু প্রশংসা পায়। কিন্তু মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য পাপ কাজে লিপ্ত হলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জায়গায় সে কেবল অসন্তোষই পায়। বাস্তবে এমনই ঘটতে দেখা যায়। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বাবা-মায়ের খোজখবর যে নেয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্ত্রী তার অনুগত ও বাধ্য হওয়ার পরিবর্তে তার উপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে। সর্বক্ষণ তিরষ্কার এমনকি গালমন্দ পর্যন্ত করে। বিপরীতে যে বাবা-মার পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর জুলুমের ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করে না বাবা-মা তার সুনাম করার বদলে খুটিনাটি নানা বিষয় নিয়ে কেবলই বদনাম করে যায়। আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করার ফলাফলটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমনই হয়। অতএব, লোক দেখানো বা সমাজ ঠেকানোর নীতি পরিত্যাগ করে যে কোনো কাজে আল্লাহর দেখানো নীতি মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট আমরা আশা করি হাদীস-কুরআনের আলোকে বা-বামা ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর বাস্তব জীবনে তার উপর আমল করবেন। লোকে কি বলবে বা সমাজে কি মান থাকবে এই প্রকৃতির বোকামিপূর্ন অযুহাত পেশ করে কারও হককে বিনষ্ট করবেন না।

৩। অজ্ঞতা ও অতিবুযুর্গী

তৃতীয় যে কারণে মানুষ অন্যের হক বিনষ্ট করে তা হলো অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে দ্বীনের কোনো বিধানের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা। কেউ হয়ত দিন রাত মসজিদে বসে নফল

নামায পড়ে, কুরআন পাঠ করে কিন্তু রিযিকের অন্বেষনে বের হয় না। ফলে তার স্ত্রী-পুত্র কষ্টে দিনপাত করে। অনেকে সারা বছর রোজা রেখে শরীর শুকিয়ে ফেলার কারণে প্রয়োজন পরিমান পরিশ্রম করার অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের উপর যতটুকু দায়িত্ব পালন করা আবশ্যিক ছিলো সে তা করতে সক্ষম হয় না। এভাবে নফল ইবাদতে অতিরঞ্জনের কারণে ফরয তরকের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিছু সাহাবা নফল ইবাদতে অতিরঞ্জন করলে রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

তোমার উপর তোমার রবের কিছু হক রয়েছে, তোমার নিজেরও কিছু হক রয়েছে, তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব, প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে আদায় কর।

[সহীহ বুখারী]

কেউ আবার কোনো একজনের অধিকার পাওনার চেয়েও বেশি আদায় করতে গিয়ে অন্যের উপর জুলুম করে। এমন অতিরঞ্জন যার ক্ষেত্রেই করা হোক তার ফলাফল শুভ হয় না। এমনকি নবী-রাসুলদের ব্যাপারেও এ ধরনের অতিরঞ্জন শিরিক-কুফুরের মত ভয়াবহ পাপের দিকে নিয়ে যায়। খ্রিষ্টানরা ইসা عليه السلام ও তার মায়ের ব্যাপারে অতিরঞ্জনের কারণে আল্লাহর সাথে তাদের শরীক করে বসে। এভাবে তারা মহান আল্লাহর হক নষ্ট করে। এ অতিরঞ্জনকে নিন্দা করে আল্লাহ سبحانه وتعالى বলেন,

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ..... وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

ওহে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করো না। আল্লাহর ব্যাপারে সত্য বৈ মিথ্যা বলোনা। ঈসা মাসীহ তো কেবলই আল্লাহর রসুল .... তোমরা (ইসা عليه السلام ও তার মাকে মিলিয়ে) তিনজন স্রষ্টাই বিশ্বাস করো না। এ থেকে বিরত হওয়াই উত্তম। আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য। [নিসা/১৭১]

দেখা যাচ্ছে, ইসা عليه السلام এর মত একজন সম্মানীত রসুল ও মারইয়াম عليها السلام এর মত একজন নেককার মহিলা সম্পর্কে অতিরঞ্জনের ফলে শিরিক-কুফরের পথ খুলে গেছে। আর তাতে মহান আল্লাহর হক বিনষ্ট হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও তাই সতর্ক করে বলেছেন,

لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ

খ্রিষ্টানরা ইসা ﷺ এর ব্যাপারে যেমন অতিরঞ্জন করেছে আমার ব্যাপারে তোমরা তেমন করোনা। আমি তো আল্লাহর একজন বান্দা। অতএব আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তার রসুল বলেই সম্মোধন করো। [সহীহ বুখারী]

অর্থাৎ আল্লাহর রসুল নিজেও আশঙ্কা করেছেন তার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করলে ফলাফল অশুভ হবে। পরবর্তীতে হয়েছেও তাই। একদল সুফী রসুলুল্লাহ ﷺ কে আলিমুল গায়েব মনে করে। কেউ আবার আল্লাহর জাতী নূর থেকে তাকে তৈরী করা হয়েছে এমন বলে। অন্য অনেকে বলে, আহমাদ আর আহাদে পার্থ্যক্য কেবল মিমে, আসলে দুজন একই (নাউযুবিল্লাহ)।

ওলি-বুযুর্গদের নিয়েও এমন অতিরঞ্জন করা হয়েছে। ওয়াজ করনী সম্পর্কে রচিত মিথ্যা কাহিনীগুলোতে এর পক্ষে ঢের প্রমান পাওয়া যায়। তার কোনোটিতে ওয়াজ করনীকে মুসা ﷺ বা আল্লাহর রসুলের চেয়েও বেশি সম্মানীত প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিলাল ﷺ এর আয়ু বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীটি এর মধ্যে অন্যতম। সেখানে বলা হয়, স্বয়ং আল্লাহর রসুল এ কাজে ব্যর্থ হলেও ওয়াজ করনী আল্লাহর কাছে দোয়া করে তার আয়ু বৃদ্ধি করে দেন। বলা বাহুল্য যে, এর মাধ্যমে আল্লাহর রসুলকে ছোট করা হয় এবং তার হক নষ্ট করা হয়। যে কারো ব্যাপারে অতিরঞ্জন এভাবেই অন্যের উপর জুলুমের কারণ হয়ে দাড়ায়। বর্তমানে মা-বাবার অধিকারের ব্যাপারে এমন অতিরঞ্জন ঘটতে দেখা যায়। পরিবহনে আল্লাহর নামের পরিবর্তে অনেক সময় লেখা হয় মায়ের দোয়া। বলা বাহুল্য যে, এটাও একপ্রকার অতিরঞ্জন। এছাড়া অনেক অতি বুযুর্গী লোক মায়ের খেদমতে স্ত্রীকে দাসীর মত ব্যবহার করে এবং এ ব্যাপারে এতটাই অতিরঞ্জন করে যে, স্ত্রীর জীবন দূর্বিসহ হয়ে পড়ে এবং অনেক স্ত্রী শেষে এমনকি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। মা-বাবার খেদমত যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপুর্ন বিষয় তাই সমাজের লোক এহেনো জুলুমকে মুখ বুজে সহ্য করে। কিন্তু সত্য কথা হলো, ইসলামে কোনো ব্যাপারেই অতিরঞ্জন এবং একজনের হক আদায় করার নামে অন্যের হক নষ্ট করা বৈধ নয়। অতএব প্রতিটি মুসলমানের উচিত একজনের হক আদায় করে অতিরঞ্জন করে অন্যের হক নষ্ট না করে প্রতেকের প্রাপ্য হক আদায় করা।

এসব মূলনীতি জেনে নেওয়ার পর এখন আমরা পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার কি

সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিভিন্ন প্রকার অধিকারের বর্ণনা

সন্তানের উপর পিতা-মাতার অধিকার

মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করো। যদি তাদের মধ্যে যেকোনো একজন বা উভয়ই তোমার নিকট বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয় (এবং অতিরিক্ত খিদমত করা লাগে) তবু তাদের উদ্দেশ্যে কখনো বিরক্ত হয়ে উফ শব্দ উচ্চারন করো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না। বরং তাদের উদ্দেশ্যে সম্মানজনক কথা বলো। তাদের উদ্দেশ্য মমতার ডানা বিছিয়ে দাও এবং বলো, হে আমার রব, আমার পিতা-মাতার উপর রহম করুন যেমন তারা ছোটবেলায় আমাকে লালনপালন করেছেন। [বনী ইসরাইল/২৩,২৪]

অন্য আয়াতে এসেছে,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। যেহেতু তার মা অনেক কষ্ট করে তাকে পেটে ধারণ করেছে এবং অনেক কষ্ট করে প্রসাব করেছে। [আহকাফ/১৫]

একটি সহীহ হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। পিতার অসন্তুষ্টিই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। [তিরমিযী]

সুনানে নাসায়ীতে হাসান সনদে বর্নিত আছে, একজন ব্যাক্তি জিহাদে গমনের ইচ্ছা করলে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমার মা কি বেচে আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন,

فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

তাহলে তার খেদমতে লেগে থাকো। কেননা জান্নাত তার দুই পায়ের নিচে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গুনাহ হলো, (الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، .... وَشَهَادَةُ الزُّورِ) "আল্লাহর সাথে শিরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ দেওয়া।"

এছাড়া বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে পিতা-মাতার সাথে সদাচারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবাধ্য হতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে তার সব উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আলোচনার সার্থে পরবর্তীতে তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

মহান আল্লাহ বলেন,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ

নেককার স্ত্রীরা স্বামীর অনুগত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে (নিজেকে এবং স্বামীর সম্পদকে) হেফাজত করে।

পরে বলেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

আর যেসব স্ত্রী তোমাদের অবাধ্য হয় তাদের প্রথমে বোঝাও, (তাতে কাজ না হলে) বিছানায় পৃথক করে দাও, (তাতেও কাজ না হলে) প্রহার করো। এভাবে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে আর কোনো খারাপ আচরণ করো না। [নিসা/৩৪]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

নেককার স্ত্রী সেই যার দিকে দৃষ্টি দিলে স্বামী খুশি হয়ে যায়, স্বামী তাকে কোনো আদেশ করলে সে তার আনুগত্য করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে (নিজেকে এবং স্বামীর সম্পদকে) হেফাজত করে। [আবু দাউদ; এর সনদ সহীহ]

অন্য হাদীসে হাসান সনদে বর্ণিত আছে,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

যে মহিলা পাচওয়াক্ত নামায পড়ে, রমজান মাসে রোজা রাখে, নিজের চরিত্র হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি প্রবেশ করতে পারবে। [ইবনে হিব্বান]

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কোনো মহিলার স্বামী উপস্থিত থাকলে তার নির্দেশ ছাড়া নফল রোজা রাখা তার জন্য বৈধ নয় এবং তার অনুমতি ছাড়া বাড়িতে কাওকে প্রবেশ করতে দেওযা তার জন্য বৈধ নয়। [বুখারী]

রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এক মহিলা আসলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে হ্যা বললে তিনি বললেন, (فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ) "তার সাথে তুমি কেমন আচরণ কর?" সে বলল, (مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ) "আমি সাধ্যমত তার খেদমত করি।" তিনি বললেন, (فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ) "সেই তোমার জান্নাত, সেই তোমার জাহান্নাম। এটা মনে রেখে তার সাথে যথাযোগ্য আচরণ করো।"

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। আল হাইছামীর মতে এর রাবিরা বিশ্বস্ত।

অন্য হাদীসে এসেছে,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ

যদি আমি কোনো মানুষকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে। [আবু দাউদ; হাদীসটি সহীহ]

অন্য হাদীসে এসেছে,

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

যদি স্বামী তার প্রয়োজনে স্ত্রীকে কাছে ডাকে তবে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো তার ডাকে সাড়া দেওয়া যদিও সে রান্না করার কাজে ব্যস্ত থাকে। [তিরমিযী; হাদীসটি হাসান]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِي عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا

কোনো মহিলা আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে না যতক্ষন না সে তার স্বামীর হক আদায় করে। এমনকি রান্নাবাড়া করার সময়ও স্বামী যদি তাকে ডাকে তবে সে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে না। [মুজামে কাবীর; হাদীসটি হাসান]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

যদি স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে আসতে অস্বীকার করে ফলে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায় তবে ফেরেস্তারা সকাল পর্যন্ত স্ত্রীর উপরে লানত করে।

[বুখারী ও মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, (كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا) "তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন।"

[সহীহ মুসলিম]

হাসান সনদে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ

দুই ব্যাক্তির নামায কবুল হয়না। যে দাস মনিবকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে যতক্ষন না সে ফিরে আসে। আর যে মহিলা স্বামীর অবাধ্য হয় যতক্ষন না সে তাওবা করে।

[মুসতাদরাকে হাকেম]

নাসায়ী সুনানে কুবরাতে এবং বাজ্জার তার মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ

আল্লাহ ঐ মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না যে মহিলা তার স্বামীর অবদান স্বীকার করেনা অথচ সে তার প্রতি নির্ভরশীল।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি দেখেছি জাহান্নামের বেশিরভাগ অধিবাসী মহিলা। এর কারণ কি জানতে চাইলে তিনি বলেন,

يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

তারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। যদি কেই তাদের সাথে সারা জীবন উত্তম আচরণ করে কিন্তু কখনও তার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পায় তবে বলে, আমি সারা জীবন তোমার কাছে ভালো কিছু পায় নি।

এসব হাদীসে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তার আনুগত্য করা, তার অনুপস্থিতিতে নিজেকে ও তার সম্পদ রক্ষা করা, সে আহবান করা মাত্র তার ডাকে সাড়া দেওয়া এমনকি তার অনুমতি ছাড়া নফল রোজা পর্যন্ত না রাখা ইত্যাদি যে সব বিষয় কুরআন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিটি নেককার স্ত্রীর উপর দায়িত্ব হলো তা আদায় করা। অহংকারবশত বা অন্য কোনো কারণে এসব ব্যাপারে অবহেলা করা মারাত্মক অন্যায়। একারণে ফেরেস্তাদের লানত ও মহান রবের গজবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, যে নারী জান্নাত পেতে চায় তাকে অবশ্যই স্বামীর এসব অধিকার আদায় করতে হবে। আর যদি মনে হয় সে তা করতে পারবে না তাবে তার উচিত হবে বিবাহই না করা বা স্বামীর কাছে অনুরোধ করে তালাক নিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া। যেহেতু স্বামীর অবাধ্য হয়ে কবীরা গোনাহ করার চেয়ে স্বামী বিহীন অবস্থায় থাকাই শ্রেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

যদি তোমাদের ভয় হয় যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর বিধান মেনে চলতে পারবে না তবে স্ত্রী দেনমহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে যদি বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চায় তবে তাতে কোনো দোষ নেই। [বাক্বারা/২২৯]

এই আয়াতে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে পারবে না বলতে কি বোঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে ইমাম কুরতুমী رحمه الله বলেন, (يترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية) "স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আল্লাহর যে বিধান আছে তা পরিত্যাগ করা" [তাফসীরে কুরতুবী]

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহর যেসব বিধি-বিধান আছে সেগুলো মেনে চলতে না পারলে ঐ বিবাহ টিকে থাকার চেয়ে ভেঙে দেওয়াই ভাল।

যেহেতু এমতাবস্থায় বিবাহ ভেঙে দেওয়া কোনো পাপের কাজ নয়। কিন্তু এই বিবাহ টিকিয়ে রেখে স্বামী বা স্ত্রীর হক বিনষ্ট করা কবীরা গোনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। একইভাবে যদি কোনো মহিলা আশঙ্কা করে বিবাহ হলে সে স্বামীর হক আদায় করতে সক্ষম হবে না। তবে বিবাহ না করে স্বামী বিহীন অবস্থায় থেকে যাওয়াই তার জন্য উত্তম।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতে হাসান সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, এক ব্যাক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে অভিযোগ করে বলল, তার মেয়ে বিবাহ করতে রাজী হচ্ছে না। রসুলুল্লাহ ﷺ ঐ মেয়েকে বললেন, (أَطِيعِي أَبَاكِ) "তোমার বাবার আনুগত্য করো"। উক্ত মহিলা তখন কসম করে বলল, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি তা না জানা পর্যন্ত আমি বিবাহ করবো না। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন স্বামীর হক সম্পর্কে তাকে অবহিত করলে উক্ত মহিলা বললেন, (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا) "যে সত্ত্বা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার কসম, আমি কখনও বিবাহ করবো না। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, (لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ) "মেয়েদের ইচ্ছার বাইরে তাদের বিবাহ দিয়ো না"।

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, যে মেয়ে নিজের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে স্বামীর হক আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয় ফলে বিবাহ হলেই সে স্বামীর অবাধ্য হয়ে কবীরা গোনাহতে লিপ্ত হবে এবং বিবাহ না হলে সে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে না তার জন্য উচিৎ হবে বিবাহ না করা। যেহেতু এক্ষেত্রে বিবাহ না করে বসে থাকা তার উপর হারাম নয় কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর হক আদায় করতে না পারলে তার কবীরা গোনাহ হবে।

দেখা যাচ্ছে, তালাক ইসলামে উত্তম বিষয় না হওয়া সত্বেও এবং বিবাহ না করা অপছন্দনীয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও যখন ভয় হয় বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার বিনষ্ট হবে তখন তালাক নেওয়া বা বিবাহ না করাই বাঞ্চনীয়। এই বিষয়টি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অধিকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

সাধারণভাবে বেশিরভাগ মানুষের মুখেই বাবা-মা ও স্বামীর অধিকারের বয়ান শোনা যায়। এমনিতে নারী অধিকারের প্রচার প্রসার থাকলেও কুরআন হাদীসে স্বামীর উপর স্ত্রীর কি অধিকার আছে সে বিষয়ে দলীল-প্রমাণসহ গঠনমূলক আলোচনা খুব একটা

শুনতে পাওয়া যায় না। অথচ স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন হক আছে স্বামীর উপরও স্ত্রীরও তেমনই কিছু হক আছে। যদিও স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিক সম্মান দেওয়া হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

স্ত্রীদের উপর যতটুকু দায়িত্ব আছে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের ততটুকু অধিকারও আছে। তবে পুরুষদের তাদের উপর অধিক সম্মান প্রদান করা হয়েছে। [বাক্বারা/২২৭]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের কিছু হক আছে আবার তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের কিছু হক আছে। [তিরমিযী, হাদীসটি হাসান]

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ،

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো। তাদের তোমাদের অধীনস্ত করে দেওয়া হয়েছে এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। [তিরমিযী, হাদীসটি হাসান]

অর্থাৎ যদি তারা স্বাভাবিকভাবে আনুগত্য করে চলে তবে তার চেয়ে বেশি দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না বা জুলুম নির্যাতন করা যাবে না।

অন্য হাদীসে এসেছে,

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ ... فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো। কেননা তাদের পাজড়ের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তুমি (তাড়াহুড়া করে) তা সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও তাবে বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব তাদের সাথে উত্তমভাবে আচরণ করো। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে,

إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها

মেয়েদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাজড়ের বাঁকা হাড় থেকে। (তাড়াহুড়া করে) তা সোজা করতে গেলে ভেঙে যাবে। অতএব, কোমল আচরণ করো। তাহলে তার সাথে সংসার করতে পারবে। [ইবনে হিব্বান]

এর ব্যাখ্যায় ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ উল্লেখ করেন,

كَانَ فِيهِ رَمْزًا إِلَى التَّقْوِيمِ بِرِفْقٍ بِحَيْثُ لَا يُبَالِغُ فِيهِ فَيَكْسِرُ وَلَا يَتْرُكُهُ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى عِوَجِهِ

এখানে ঠান্ডা মাথায় মেয়েদের সংশোধন করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাতে এমন কড়াকড়ি না করে যাতে ভেঙে যায়। আবার একেবারে ছেড়েও দেবে না যাতে বাঁকাই থেকে যায়। [ফাতহুল বারী]

অন্য হাদীসে এসেছে,

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

মেয়েদের পাজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো কাজেই তুমি তাদের পুরোপুরি মনমতো পাবে না। তবে যদি তুমি তাদের উপভোগ করার চেষ্টা করো তাহলে বাঁকা অবস্থায়ই উপভোগ করতে পারবে। আর যদি সংশোধনের চেষ্টা করো তবে ভেঙে যাবে। আর ভেঙে যাওয়া অর্থ হলো তালাক হয়ে যাওয়া। [মুসলিম]

এই হাদীসে বলা হয়েছে, মেয়েদের বাঁকা স্বভাব কখনই পুরোপুরি সারবে না। ফলে পরিপূর্ণ সংশোধন করতে গেলে শেষে সংসারই ভেঙে যাবে। তাই তাদের পুরোপুরি সংশোধনের চেষ্টা না করে কিছুটা বাকা অবস্থায়ই উপভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, মেয়েরা যেমন আচরণ করবে সেটাই মেনে নিতে হবে। যেহেতু অন্য আয়াত ও হাদীসে স্বামীর আনুগত্য না করলে শাসন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবাধ্য স্ত্রী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) “প্রথমে তাদের উপদেশ দাও, তাতে কাজ না হলে বিছানায় পৃথক করে দাও, তাতেও কাজ না হলে (প্রয়োজন মতো) প্রহার করো”

[নিসা/২৪]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَأَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمُ الْعَصَا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ

তোমার পরিবারের উপর সাধ্যমতো ব্যয় করো। আর তাদের উপর থেকে লাঠি তুলে নিয়ো না (শাসন করা বন্ধ করো না)। বরং আল্লাহর পথে চলার জন্য তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করো।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ, তাবারানী, বাইহাক্বী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এর একটি সনদ সম্পর্কে আল হাইছামী বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ

তাবারানী এটা বর্ণনা করেছেন। এর রাবীদের মধ্যে শাহর ইবনে হাওশাব হাসান রাবী আর বাকীরা বিশ্বস্ত।

এছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনজন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তার মধ্যে একজন হলো, দাউস (الديوث)। [মুস্তাদরাকে হাকিম, আজজাহাবী সহীহ বলেছেন] অন্য হাদীসে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, (الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ) "যে তার পরিবারের লোকদের অনৈতিক কর্মকান্ড মুখ বুজে সহ্য করে"। [মুসনাদে আহমাদ]

অতএব, উপরের হাদীসে স্ত্রীরা স্বভাবজাতভাবেই বাঁকা তাই বাঁকা অবস্থায় রেখে দিয়ে উপভোগ করার অর্থ এমন নয় যে, তারা যাই করুক তা মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, তাড়াহুড়া না করে ঠান্ডা মাথায় প্রথমে বুঝিয়ে এবং তাতে কাজ না হলে প্রয়োজন মতো শাসন করে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা। এর পরও কিছু ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি তাদের মধ্যে থেকে গেলে তা সহ্য করা। যেহেতু পরিপূর্ণ সংশোধন হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ইবনে হাযার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَتْرُكَهَا عَلَى اعْوِجَاجِهَا فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ

স্ত্রীদের বাঁকা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [ফাতহুল বারী]

অন্য হাদীসে এসেছে,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোনো মুমিন যেনো তার মুমিন স্ত্রীকে (হঠাৎ) অপছন্দ করে না বসে। হয়তো তার

মধ্যে কোনো একটি বিষয় সে অপছন্দ করবে কিন্তু অন্য একটি বিষয় তার পছন্দ হবে। [মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী ঐ সকল লোকেরা যাদের আখলাক চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারা যারা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করে। [নাসায়ী] হাদীসটির সনদ হাসান।

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ কে বলা হলো, আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের অধিকার কি? তিনি বললেন,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

যখন তোমার খাবার জোটে তুমি তাকেও খাওয়াবে। আর যখন তোমার পোশাক জোটে বা তুমি উপার্জন করো তখন তুমি তাকেও পরিধান করতে দেবে। আর (কোনো কারণে প্রহার করতে হলে) তাদের চেহারার উপর প্রহার করবে না। তাদের প্রতি গাল-মন্দ দেবে না। আর বাড়ি থেকে বের করে দেবে না। [আবু দাউদ, হাসান হাদীস]

অন্য হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, যদি আমরা জানতাম সর্বোত্তম সম্পদ কোনটি তবে তা জমা করে রাখতাম। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ

সর্বোত্তম সম্পদ হলো, এমন জিহবা যা সদা আল্লাহকে স্মরণ করে, আর এমন অন্তর যা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করে আর নেককার স্ত্রী যে তাকে ঈমানের ব্যাপারে সহযোগিতা করে। [তিরমিযী, হাদীসটি হাসান]

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

যাকে আল্লাহ একজন নেককার স্ত্রী প্রদান করেন তার অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করেন। এখন বাকী অর্ধেক ঠিক রাখলেই হবে।

হাদীসটি হাকীম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং আজ-জাহাবী সহীহ বলেছেন।

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا, فَمَاتَ, وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ

যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে কম বেশি যাই হোক একটা দেন মোহর ঠিক করে বিয়ে করে কিন্তু বিয়ের সময়ই তার নিয়ত ছিলো সম্পূর্ণ দেনমহোর আদায় করবে না তবে তাকে ধোকা দিলো এবং এভাবে মারা গেলে সে কিয়ামতের দিন জেনাকারী হিসেবে উঠবে। [আহমদ, তাবারানী]

আল-হাইছামী বলেন, (وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ) “এর রাবীরা বিশ্বস্ত”।

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ

ঐ চুক্তি সবার আগে পালন করা উচিৎ যার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করে নিয়েছো। [বুখারী ও মুসলিম]

অর্থাৎ বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীর সাথে যে চুক্তি করে সেটা রক্ষা করার ব্যাপারে সর্বাধিক যত্নবান হওয়া উচিৎ। যেহেতু এই চুক্তির মাধ্যমেই সে তার স্ত্রীকে নিজের জন্য বৈধ করে নিয়েছে। অতএব ঐ সকল চুক্তি পালনে অবহেলা করলে স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তাদেরকে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানতস্বরুপ গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর বিধানের মাধ্যমেই তোমরা তাদের নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছো। [মুসলিম]

ইমাম সুয়ুতী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أي أن الله ائتمنكم عَلَيْهِنَّ فَيجب حفظ الْأَمَانَة وصيانتها بمراعاة حُقُوقهَا

এর অর্থ হলো, আল্লাহ তোমাদের নিকট তাদেরকে আমানতস্বরুপ রেখেছেন। অতএব, এই আমানত রক্ষা করা এবং তার হক আদায় করা একান্ত আবশ্যক বিষয়।

[শারহে মুসলিম]

ইমাম নাব্বী ﷺ বলেন,

فِيهِ الْحَثُّ عَلَى مُرَاعَاةِ حَقِّ النِّسَاءِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِنَّ وَمُعَاشَرَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

এই হাদীসে মেয়েদের হক আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। [শারহে মুসলিম]

এসব আয়াত ও হাদীসে স্বামীর উপর স্ত্রীর হক আদায় করার একান্ত আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। যারা অজ্ঞতার কারণে বা অতি বুযুর্গীর কারণে পিতা-মাতা বা অন্য কারো অধিকার আদায় করার অজুহাতে স্ত্রীর হক নষ্ট করে তাদের জন্য এসব দলীল-প্রমাণের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। তাদের উচিৎ তওবা করে ফিরে আসা এবং কোনো একজনের হক আদায়ের নামে অন্যের হক বিনষ্ট না করে সবার হক সমানভাবে আদায় করার জন্য স্বচেষ্ট হওয়া।

পিতা মাতার আনুগত্যের স্বীমা-পরিসীমা।

অনেকেই মনে করেন পিতা-মাতার আনুগত্যের বিষয়টি অসীম, এর কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তারা যে নির্দেশই দিক তা বিনা বাক্যে মেনে নেওয়াই বাধ্য ছেলের কাজ। এখানে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতার আনুগত্য বলতে অনেকে বোঝেন পিতা-মাতা যা বলে তাই মেনে চলা। যদি তারা স্ত্রীকে নিজেদের কাছে রেখে জুলুম-নির্যাতন করতে চাই তবে এক শ্রেণীর লোক মনে করে এটাই পিতা মাতার অধিকার এবং তা আদাই করা উচিৎ। অনেক ছেলে আয় উপার্জন যা করে মা-বাবার হাতে তুলে দেয় আর স্ত্রীর ভরন পোষনের দায়িত্বও সরাসরি মা-বাবার উপর ছেড়ে দেয়। এক্ষেত্রে এমনকি পিতা-মাতা যদি স্ত্রীকে খাদ্য-বস্ত্রের মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তবু তারা স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা সংসারের কল্পণা পর্যন্ত করতে পারে না। কারণ তাদের দৃষ্টিতে এটা পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া হিসেবেই গণ্য। কিছু হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে অনেকে জাহেল পিতা-মাতার নির্দেশ শুনে নেককার স্ত্রীকে তালাক দেওয়াও নিজের উপর আবশ্যক মনে করেন। এভাবে সাজানো সংসার ভেঙে দিয়ে

নিজেও যেমন বিপদে পড়েন স্ত্রীকেও মহা বিপদের দিকে ঠেলে দেন। এসব সমস্যার সমাধান করতে হলে পিতা-মাতার আনুগত্য বলতে ইসলামে আসলে কি বোঝায় এবং বিবাহ-তালাকের মতো ব্যক্তিগত বিষয়েও পিতা-মাতার নির্দেশ মেনে চলা আবশ্যক কিনা সে বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ। সেই সাথে পিতা-মাতার মনতুষ্টির জন্য স্ত্রীকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অবাধে জুলুম-নির্যাতন করতে দেওয়া বুযুর্গের কাজ কিনা সেটাও আমাদের স্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে।

সাধারণভাবে মনে করা হয়, পিতা-মাতার নির্দেশ সর্বাবস্থায় মেনে চলতে হবে। কুরআন হাদীসে পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে যে সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে কারণেই অনেকে এমন মনে করে থাকেন। তারা এটা ভুলে যায় যে, সাধারণ নির্দেশ সর্বাবস্থায় সবার উপর প্রযোজ্য হয় না। বরং এর কিছু ব্যতিক্রম থাকে। উসুলের পরিভাষায় এই বিষয়টিকে বলা হয় আম খাস হয়ে যাওয়া। এক তরফাভাবে যে কোনো এক পক্ষের দলীল প্রমাণের উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা এবং পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করার মাধ্যমে এসব বিষয়ে সঠিক ধারনা লাভ করা যায়। এ পন্থা অবলম্বন না করে কোনো একটি আয়াত ও হাদীসের উপর এককভাবে নির্ভর করে ফতোয়া দিলে ব্যাপক ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। পিতা-মাতার আনুগত্যের বিষয়টিকে যারা সর্বাবস্থায় অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় বিধান বলে মনে করেন বাস্তব জীবনে তারা এর উপর আমল করতে গিয়ে নানা রকম সমস্যায় পতিত হবেন। লোভী পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও কোনো অসুন্দর ও অসৎ স্বভাবের মেয়েকে বিবাহ করে সারাটা জীবন অশান্তি ভোগ করা, তাদের নির্দেশে নেককার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বাকীটা জীবন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো, অবিবেচক পিতা-মাতার নির্দেশে নিজের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এবং সবশেষে বিদয়াতী ও বিভ্রান্ত পিতা-মাতার নির্দেশে দ্বীনদার লোকদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে অসৎ সঙ্গে মিশতে শুরু করা ইত্যাদি কর্মকান্ড এখন এতটাই বেশি ঘটছে এবং তার কারণে এতই বেশি ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে যে, সে সম্পর্কে আলাদাভাবে চিন্তা-গবেষণা করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। জীবনের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ছোট বড় সকল বিষয়ে সত্যিই কি পিতা-মাতাকে এভাবে মেনে চলা উচিৎ। পিতা-মাতা যখন নিজেরা জুলুম করে তখনও কি মুখ বুজে তা সহ্য করা উচিৎ। অজ্ঞতার কারণে পিতা-মাতা যদি অযৌক্তিক নির্দেশ দেয় সেটাও কি মেনে চলা

উচিৎ? এ যুগের বেশিরভাগ বুযুর্গ ব্যক্তিই এসব প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়ে থাকেন। পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে তারা এতটাই অতিরঞ্জন করেন যে তার সাথে অন্য কারো হক আদায় করাই সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে তারা ঐ সকল হাদীস উল্লেখ করেন যেখানে পিতা-মাতার আনুগত্য করতে বলা হয়েছে, পিতার নির্দেশে নিজের স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পিতা চাইলে সমস্ত সম্পদ তার হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছে। এসব হাদীস এক তরফাভাবে উত্থাপন করে যে কোনো বিষয়ে পিতা-মাতার একচেটিয়া আনুগত্যের বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কুরআন হাদীস এক তরফাভাবে উপস্থাপন করলে যে কোনো ব্যাপারেই এমন একপেশে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায়। স্ত্রীর হকের ব্যাপারেও এমন তেলসমাতি সহজেই করা যায়। যেহেতু পূর্বে আমরা বলেছি, রসুলুল্লাহ ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

মেয়েদের পাজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো কাজেই তুমি তাদের পুরোপুরি মনমতো পাবে না। তবে যদি তুমি তাদের উপভোগ করার চেষ্টা করো তাহলে বাঁকা অবস্থায়ই উপভোগ করতে পারবে। আর যদি সংশোধনের চেষ্টা করো তবে ভেঙে যাবে আর ভেঙে যাওয়া অর্থ হলো তালাক হয়ে যাওয়া। [মুসলিম]

এই হাদীস থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হয় যে, স্ত্রীরা বাঁকা আচরণ করবেই। তাই তা সংশোধনের চেষ্টা করা বৃথা। তারচেয়ে বরং যেমন আছে তেমনভাবেই তাদের উপভোগ করার চেষ্টা করা উচিৎ। এছাড়া অন্যান্য হাদীসে স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন অন্য সব হাদীস ভুলে কেবল এই পক্ষের হাদীসের উপর নির্ভর করলে সাংসারিক জীবনে স্ত্রীকে প্রহার করা তো দূরের কথা একটা ধমক পর্যন্ত দেওয়া বৈধ মনে হয় না। স্ত্রীকে দিয়ে নিজের বাবা-মা তো দূরের কথা নিজের খেদমতও করানো যাবে না। বরং নিজেই তার খেদমত করতে হবে এমন মনে হয়। কিন্তু এই বুঝ সঠিক নয়। যেহেতু অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে স্ত্রীকে শাসন করা এবং তার উপর কর্তৃত্ব করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, সঠিক বুঝ পেতে হলে এক তরফাভাবে হাদীস উল্লেখ করলে হবে না। বরং বিভিন্ন হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং কুরআন হাদীসের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে

অনুসরণ করতে হবে।

নিচে এইসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে সাধারণ মূলনীতি

পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মূলনীতি হলো, দাস যেভাবে মনীবের আনুগত্য করতে বাধ্য থাকে সন্তান পিতা-মাতাকে সেভাবে আনুগত্য করতে বাধ্য নয়। বিবাহ, ব্যাবসা, চলাফেরা ইত্যাদি কোনো ব্যাপারে দাসের ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। যেহেতু সে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ নয়। কিন্তু সন্তান স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হওয়ার কারণে এসব ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত চিন্তার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কারো আনুগত্যে বাধ্য করা হয় বটে কিন্তু সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে তার আচরণ হয় স্বাধীন মানুষের মতো। যতটুকু ফরজ তার বাইরে অতিরিক্ত ইলম অর্জন করার জন্য পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই সফর করা বৈধ কিনা সে সম্পর্কে ইমামুল হারামাইন আবুল মায়ালী ﵀ বলেন,

فعلى وجهين: أصحهما - الجواز؛ فإن الإنسان مطلقٌ لا حجر عليه فلو حرمنا عليه الخروج دون رضا الوالدين؛ لكان ذلك مفضياً إلى حبسه ومنعه من الانتشار في أرض الله تعالى

এ ব্যাপারে দুটি মত আছে। সঠিক মতটি হলো, এটা বৈধ। যেহেতু মানুষ স্বাধীন সে কারো হাতে বন্দি নয়। এখন যদি আমরা পিতা-মাতার সম্মতি ছাড়া বের হওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করি তবে এর ফলাফল হবে তাকে আটকে ফেলা এবং আল্লাহর দুনিয়ায় মুক্তভাবে চলাফেলা করা হতে বাধাগ্রস্ত করা। [নিহায়াতুল মাতলাব]

ইমাম গাজ্জালী ﵀ এ সম্পর্কে বলেন,

فَفِيهِ وَجْهَان الظَّاهِر أَنه يجوز بِغَيْر إِذن لِأَنَّهُ حر مُسْتَقل وَإِنَّمَا عَلَيْهِ دفع ضَرَر التحزن فِي سفر مهلك كالجهاد

এ বিষয়ে দুটি মত আছে। অধিক সঠিক মতটি হলো, পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই এটা বৈধ। যেহেতু সে স্বাধীন মানুষ (তাই সার্বিক ব্যাপারে কারো আনুগত্য করে চলা তার উপর দায়িত্ব নয়)। তার উপর দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে, সে জিহাদ বা অন্য যেসব সফরে প্রান নাশের আশঙ্কা আছে তাতে গমন করে পিতা-মাতাকে মহা চিন্তায় ফেলে না দেওয়া। [ওয়াসীত]

তিনি আরো বলেন,

أما الْأَسْفَار الْمُبَاحَة كالتجارة وَغَيرهَا مِمَّا فِيهِ خطر كركوب الْبَحْر والبوادي المخطرة فَلَا يجوز إِلَّا بِإِذن وَمَا عدا ذَلِك فَالظَّاهِر جَوَازه لِأَن فِي مَنعه إِضْرَارًا بِهِ أَيْضا وَحقه أولى

ব্যবসা বা অন্যান্য বৈধ উদ্দেশ্যে সফরে যদি প্রান নাশের হুমকী থাকে যেমন, তৎকালীন সময়ে সমুদ্র যাত্রা বা ভয়ংকার মরুভুমী পাড়ি দেওয়া তবে তা বৈধ হবে না। এছাড়া সাধারণ সফর বৈধ হওযার মতটিই সঠিক। কেননা এ থেকে নিষেধ করা হলে তার (বৈষয়িক) ক্ষয়ক্ষতি হবে। আর তার নিজের হক রক্ষা করাই অধিক যোগ্য। [ওয়াসিত]

দেখা যাচ্ছে, পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদ বের না হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীস থাকার পরও ওলামায়ে কেরাম সকল প্রকার সফরে পিতা-মাতার অনুমতি শর্ত করেননি বরং জিহাদের সঙ্গে কিয়াস করে যেসব সফরে প্রান নাশের হুমকি আছে কেবল সেখানে পিতা-মাতার অনুমতি শর্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় বিশেষ কিছু স্থান ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চলার অনুমতি সন্তানের রয়েছে।

ইবনে হাজার হাইতামী ﷺ বলেন,

إِذَا ثَبَتَ رُشْدُ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ صَلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ مَعًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَنْعِهِ مِنْ السَّعْي فِيمَا يَنْفَعُهُ دِينًا أَوْ دُنْيَا

নিজের দ্বীন ও সম্পদ রক্ষার মত সুবুদ্ধি যে পুত্রের থাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যান হাসিলের জন্য সে যা করতে চায় তাতে তার বাবা বাধা দিতে পারে না।

[ফাতওয়ায়ে কুবরা]

ইবনে দাকীকিল ঈদ ﷺ বলেন,

فَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ طَاعَتُهُمَا فِي كُلِّ مَا يَأْمُرَانِ بِهِ، وَلَا فِي كُلِّ مَا يَنْهَيَانِ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ

সন্তানের উপর পিতা-মাতা যা কিছু আদশ বা নিষেধ করে তার সবই মেনে চলতে হবে এটা আবশ্যক নয়। এ ব্যপারে সকল আলেম একমত।

তিনি আরও বলেন,

إِلَّا أَنَّ ضَبْطَ الْوَاجِبِ مِنْ الطَّاعَةِ لَهُمَا، وَالْمُحَرَّمِ مِنْ الْعُقُوقِ لَهُمَا: فِيهِ عُسْرٌ

তবে কোন বিষয়ে তাদের আনুগত্য ওয়াজিব আর কোন বিষয়ে তাদের অবাধ্য হওয়া

হারাম সেটা নির্ণয় করা একটু কঠিন।

শেষে তিনি বলেন,

فَلَيْسَ يَبْعُدُ أَنْ يُسْلَكَ فِي ذَلِكَ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الْكَبَائِرِ، وَهُوَ أَنْ تُقَاسَ الْمَصَالِحُ فِي طَرَفِ الثُّبُوتِ بِالْمَصَالِحِ الَّتِي وَجَبَتْ لِأَجْلِهَا، وَالْمَفَاسِدُ فِي طَرَفِ الْعَدَمِ بِالْمَفَاسِدِ الَّتِي حُرِّمَتْ لِأَجْلِهَا

কবিরা গুনাহ সম্পর্কে আমরা যে মূলনীতির কথা বলেছি এখানে তার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। আর তা হলো, যে কল্যান হাসিল করার জন্য কোনো কিছু ফরয করা হয় এবং যে অকল্যানের দিকে দৃষ্টি রেখে কোনো কিছু হারাম করা হয় সে দিকে খেয়াল রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা। [ইহকামুল আহকাম]

অর্থাৎ পিতা-মাতার আনুগত্য করে কল্যান হচ্ছে না অকল্যান হচ্ছে সেটা ভেবে দেখা। এ বিষয়ে ইবনে হাজার হাইতামী ﷺ অতিব সুন্দর ব্যাখ্যা বিশ্লেষন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ ..... وَأَمْرُهُ لِوَلَدِهِ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ لَا مَشَقَّةَ عَلَى الْوَلَدِ فِيهِ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَلَدِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إِنْ تَأَذَّى أَذًى لَيْسَ بِالْهَيِّنِ إِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَقْطَعْ كُلُّ عَاقِلٍ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَبِ مُجَرَّدَ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ

যদি পিতা কেবলমাত্র বোকামীর উপর নির্ভর করে কোনো বিষয়ে আদেশ করে বা নিষেধ করে তাবে সন্তান সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। .... আর যদি পিতা কোনো বৈধ বিষয়ের আদেশ করে এবং তা পালন করা সন্তানের পক্ষে কষ্টকর না হয় আর এমন হয় যে, তা না করলে পিতা মারাত্মকভাবে মানসিক কষ্ট পাবে তবে সে আদেশ পালন করা সন্তানের উপর আবশ্যক হবে। যদি না বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ স্বাক্ষ দেয় যে ঐ বিষয়ে কষ্ট পাওয়াটা পিতার জন্য বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা (অর্থাৎ আসলে বিষয়টি অত কষ্টকর নয়)।

দেখা যাচ্ছে, পিতা মাতার যেকোনো আদেশ নিষেধের অবাধ্য হওয়াই পাপের কাজ নয়। যতক্ষন না এমন হয় যে, কোন একটি আদেশ অমান্য করলে পিতা-মাতা ভীষনভাবে কষ্ট পায়। এক্ষেত্রে হালকা কষ্ট ধার্তব্যের বিষয় নয়। যেহেতু যে কোনো আদেশ-নিষেধ অমান্য করলেই কম বেশি কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। তবে যেসব বিষয়ে পিতা-মাতা ভিষনভাবে কষ্ট পায় সেখানে অবাধ্য হওয়া পাপের কাজ। সেক্ষেত্রেও যদি

দেখা যায়, যে বিষয়ে পিতা-মাতা কষ্ট পাচ্ছে তা অন্যায় বা অযৌতিক তবে তা অমান্য করলে পাপ হবে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ইবনে হাজার হাইতামী ﷺ বলেন,

لِأَنِّي أُقَيِّدُ حِلّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْعُقُوقِ بِأَنْ يَفْعَلَ مَعَ وَالِدِهِ مَا يَتَأَذَّى بِهِ إِيذَاءً لَيْسَ بِالْهَيِّنِ بِمَا إِذَا كَانَ قَدْ يُعْذِرُ عُرْفًا بِتَأَذِّيه بِهِ أَمَّا إِذَا كَانَ تَأَذِّيه بِهِ لَا يَعْذُرُهُ أَحَدٌ بِهِ لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَشَأَ عَنْ سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ التَّأَذِّي وَإِلَّا لَوَجَبَ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ لَوْ أَمَرَهُ بِهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ. وَلَقَدْ شَاهَدْت مِنْ بَعْضِ الْآبَاءِ مَعَ أَبْنَائِهِمْ أُمُورًا فِي غَايَةِ الْحُمْقِ الَّتِي أَوْجَبَتْ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَعْذُرَ الْوَلَدَ وَيُخَطِّئَ الْوَالِدَ فَلَا يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ

পরবর্তী যুগের আলেমরা পিতা-মাতার অবাধ্যতা বলতে (যেকোনো বিষয়ে তাদের নির্দেশ অমান্য করা নয় বরং) যেসব বিষয়ে তাদের অবাধ্য হলে তারা ভিষনভাবে কষ্ট পাবে কেবল সেসব বিষয়কে বুঝেছেন। আর আমি মনে করি এখানে আরও একটি শর্ত রয়েছে। আর তার হলো, যে বিষয়ে পিতা-মাতা কষ্ট পাচ্ছে তা স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কষ্ট পাওয়ার মত বিষয় কিনা। যদি এমন হয় যে, ঐ বিষয়ে কষ্ট পাওয়া আসলে যৌতিক নয়। বরং অসৎ চরিত্র বা বোকামী ও অজ্ঞতার কারণেই তারা কষ্ট পাচ্ছে তবে ঐ কষ্টের কোনো মূল্য নেই। তা না হলে পিতা-মাতা স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে তালাক দেওয়া আবশ্যক হতো। কিন্তু আলেমরা এটা বলেননি। আমি এমন অনেক পিতা-মাতাকে দেখেছি যারা সন্তানদের উপর এমন অনেক বিষয় চাপিয়ে দেয় যা স্পষ্ট বোকামী। যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যাক্তি সে সম্পর্কে শুনলে পিতাকেই দোষ দেবে আর ঐ নির্দেশ অমান্য করলে পুত্রকে ওজর দেবে। অতএব এই শর্তটি অযৌক্তিক নয়।

[ফাতাওয়ায়ে কুবরা[

শেষে তিনি বলেন,

وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلْيَحْتَرِزْ الْوَلَدُ مِنْ مُخَالَفَةِ وَالِدِهِ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهَا اغْتِرَارًا بِظَوَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا بَلْ عَلَيْهِ التَّحَرِّي التَّامُّ فِي ذَلِكَ وَالرُّجُوعُ لِمَنْ يَثِقُ بِدِينِهِمْ وَكَمَالِ عَقْلِهِمْ فَإِنْ رَأَوْا لِلْوَالِدِ عُذْرًا صَحِيحًا فِي الْأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ طَاعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَوْا لَهُ عُذْرًا صَحِيحًا لَمْ يَلْزَمْهُ طَاعَتُهُ لَكِنَّهَا تَتَأَكَّدُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا نَقْصُ دِينِ الْوَلَدِ وَعِلْمِهِ أَوْ تَعَلُّمِهِ

এ সত্বেও সন্তাদের উচিত এসব বাহ্যিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে (তাড়াহুড়া করে) পিতার অবাধ্য না হওয়া। বরং তার দায়িত্ব হলো, ভালোভাবে চিন্তাগবেষনা করে নেওয়া এবং সে যাদের জ্ঞান বুদ্ধির ও দ্বীনদারিত্বের উপর ভরসা করে তাদের নিকট পরামর্শ করা। যদি তারা পিতার আদেশ-নিষেধের মাঝে যৌতিকতা খুজে পায় তবে পুত্রের

উপর তার আনুগত্য করা আবশ্যক হবে। আর যদি কোনো যৌতিকতা খুজে না পাওয়া যায় তবে পুত্রের উপর পিতার আনুগত্য করা আবশ্যক হবে না। তবে তার উপর এটা করা উচিত হবে। যদি না একারণে তার ঈমান-আমলের কোনো কমতি ঘটে।

[ফাতওয়ায়ে কুবরা]

ইবনে তাইমিয়া ﵀ এ বিষয়ে সংক্ষেপে অতি সুন্দর মুলনীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، .... وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ

মানুষের উপর আবশ্যক হলো পাপের কাজ ছাড়া অন্য বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য করা। যদিও তারা দ্বীনদার না হয়। এটা সেই বিষয়ে যাতে পিতা-মাতার কোনো উপকার নিহীত আছে। আর সন্তানের উপর কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই। [ফাতাওয়ায়ে কুবরা]

উপোরোক্ত আলোচনার উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে বলা যায়, পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে তিনটি মুলনীতি রয়েছে।

এক. পাপের কাজে আনুগত্য নেই। যদি পিতা-মাতা কোনো পাপের কাজে নির্দেশ দেয় তবে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) "স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই।"

দুই. সন্তানের ক্ষয়ক্ষতিতে পিতা-মাতার আনুগত্য নেই। যেসব বিষয় সরসরি পাপের কাজ নয় কিন্তু তার মধ্যে সন্তানের দ্বীন দুনিয়ার ক্ষয়ক্ষতি নিহিত আছে সেসব বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। যেহেতু সেক্ষেত্রে তার নিজের হক বিনষ্ট হচ্ছে। আর রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) "কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না"। [ইবনে মাযাহ;সহীহ]

তিন. আদেশ-নিষেধের যৌতিক কারণ থাকতে হবে। যেসব বিষয় পাপের কাজ নয় আবার তেমন কোনো ক্ষতিকর বিষয়ও নয় সেসব কাজেই মূলত পিতা-মাতর আনুগত্য প্রযোজ্য হয়। তবে সেখানেও লক্ষ রাখতে হবে আদেশ-নিষেধের যৌতিক কোনো কারণ আছে নাকি কেবল বোকামীবশত বা খেলতামাশার জন্য আদেশ-নিষেধ দেওয়া হচ্ছে। যেমন, পিতা-মাতা যদি রোদে দাড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে বা সারা জীবন কোনো তিতো

ফলের রস খেয়ে যাওয়ার ওছিয়ত করে। যদি এটা চিকিৎসা বা অন্য কোনো গ্রহনযোগ্য উদ্দেশে না হয় তবে সারাটা জীবন এ নির্দেশ পালন করতে থাকা স্পষ্ট বোকামী ও হাস্যকর বিষয় বলে গণ্য হবে। বলা বাহুল্য যে, দ্বীন নিয়ে এমন খেলতামাশা করার জন্য সন্তানদের উপর পিতা-মাতার আনুগত্য আবশ্যক করা হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا) "যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল তামাশার বিষয়ে পরিনত করেছে তাদের পরিত্যাগ করুন।" [আনয়াম/৭০]

সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবলই চোখ-কান বুজে পিতা-মাতার আনুগত্য করে যাওয়ার দিক্ষা অনুসরন করা যাবে না। বরং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ সব মূলনীতির আলোকে কখনও তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক হবে। আবার কখনও তাদের আনুগত্য করা অবৈধ হবে। অতএব, চোখ কান খোলা রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সন্তানের উচিৎ সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী ও আস্থাভাজন আলেম-ওলামাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা। যেসব আলেম-ওলামা সমাজের তালে গা ভাসিয়ে দিয়ে কেবলই পিতা-মাতার পক্ষে কথা বলে কিন্তু স্ত্রীর হকের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এসব ব্যাপারে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামে মতামতের দিকেও লক্ষ্য রাখে না। তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে না। যেহেতু তারা একজনের অধিকারের ব্যাপারে অতিরঞ্জন আর অন্য জনকে বঞ্চিত করার ফতোয়াই দিয়ে থাকে।

সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য

একটি হাদীসে এসেছে, একজন সাহাবী রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমার পিতা আমার সম্পদ লুটেপুটে খেতে চায়। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার"। [ইবনে মাযা, সহীহ] এই হাদীসের উপর নির্ভর করে কেউ বলতে পারে সন্তানের যাবতীয় সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হলেন পিতা। তিনি তা যতটুকু খুশি গ্রহণ করবেন এবং যেখানে খুশি ব্যয় করবেন। অতএব, সন্তানের উচিৎ নিজের সম্পূর্ণ আয়-উপার্জন পিতা-মাতার হাতে তুলে দেওয়া। তারপর পিতা-মাতা সে সম্পত্তি বিলাসিতা করে উড়িয়ে দিক বা এক ছেলের মাথায় কাঠাল ভেঙে অন্য ছেলেকে বড়োলোক করে দিক তাতে সে আপত্তি করতে পারে না। বরং দয়া করে তার পিতা-মাতা স্ত্রী-সন্তানদের পিছনে যতটুকু খরচ করে তাই যথেষ্ট মনে করবে। বলাবাহুল্য যে, এ ধরণের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বাতিল ও বিভ্রান্ত চিন্তাধারা। স্বাভাবিক

বিচার বুদ্ধি এবং কুরআনে-হাদীসের বিভিন্ন প্রকার দলীল প্রমাণের উপর চিন্তা-গবেষণা না করার কারণে এমন উদ্ভট মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত সত্য হলো, সন্তানের সম্পত্তির প্রকৃত মালিক সে নিজেই। আর তার স্ত্রী-সন্তান ও দাস-দাসীদের ভরন পোষণের দায়িত্বও তারই উপর। উক্ত সম্পদে যদি যাকাত ফরজ হয় তবে তা আদায় করার দায়-দায়িত্বও তার। যদি সে পিতা-মাতার হাতে সমস্ত সম্পত্তি তুলে দেয় আর তার পিতা-মাতা যাকাত আদায় না করে বা স্ত্রী-সন্তানদের হক আদায়ে ত্রুটি করে তবে তার পাপের ভারও তারই উপর পড়বে। এই সম্পত্তির প্রকৃত মালিক যে সে নিজে তার পিতা নয়, তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হলো, সে মারা গেলে কেবল পিতা একা তার সম্পত্তি দখল করে না বরং তার স্ত্রী-সন্তান ও অন্যান্য ওয়ারিছরাও অংশ পায়।

ইমাম শাওকানী ﵀ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে রিসলান ﵀ থেকে উল্লেখ করেন,

اللَّامُ لِلْإِبَاحَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ، فَإِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لَهُ وَزَكَاتَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَوْرُوثٌ عَنْهُ

এখানে উদ্দেশ্য হলো, পিতা সন্তানের সম্পত্তি হতে (প্রয়োজন পরিমাণ) গ্রহন করতে পারবে। সম্পদের মালিকানা পিতার এটা উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু সন্তানের সম্পদের মালিক আসলে সে নিজে। উক্ত সম্পদের যাকাত (ও অন্যান্য হাক) আদায় করার দায়িত্বও তার। সে মারা গেলে তার ওয়ারিছরাই তাতে অংশ পায় (বাবা একা নয়)।

[নাইলুল আওতার]

সন্তানের সম্পত্তির মালিক যে আসলে সে নিজে এবং পিতা চাইলেই সে যে নিজের সম্পত্তি তাকে প্রদান করতে বাধ্য নয় সে ব্যাপারে দলীল হলো সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীস। সেখানে এসেছে ইয়াযিদ নামক এক সাহাবী কিছু টাকা দান করার ইচ্ছা করলে এক ব্যক্তির নিকট টাকা দিয়ে যে কাউকে দান করার জন্য নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে তারই পুত্র মা'ন এসে ঐ দানের টাকা নিয়ে গেলো। পরবর্তীতে ঐ সাহাবা ঘটনা শুনে আপত্তি করে বললেন, আমি তো তোমাকে দান করার ইচ্ছা করিনি। অর্থাৎ তিনি তাকে টাকাটা ফেরত দিতে বলছিলেন। কিন্তু তার ছেলে এটা মেনে নিতে নারাজ হলো। শেষে তারা রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বিচার প্রার্থী হলো। রসুলুল্লাহ ﷺ সব শুনে বললেন, (لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ) "হে ইয়াযিদ তুমি যে দানের নিয়ত করেছো এর জন্য তুমি সওয়াব পাবে। আর হে মা'ন তুমি যা গ্রহণ করেছো তার মালিক

তুমিই”। [বুখারী]

দেখা যাচ্ছে, পিতার কাছ থেকে সদ্য দান হিসেবে গ্রহণ করার টাকাও যদি সন্তান ফেরত দিতে না চায় এমনকি এ নিয়ে মামলা মোকোদ্দমা করে তবে তা অন্যায় হবে না। যদি সন্তানের সকল সম্পদই পিতার হতো তাহলে পিতা চাহিবা মাত্রই সে তা প্রদান করতে বাধ্য থাকতো। রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া বৈধ হতো না। বিচারের রায়ও তার পক্ষে যেতো না।

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﷀ বলেন,

وَفِيهِ جَوَازُ التَّحَاكُمِ بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ عُقُوق

এই হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পিতা ও পুত্রের মাঝে বিবাদ হলে তার বিচার চাওয়া বৈধ। এটা করলে পুত্র পিতার অবাধ্য হয়েছে বলে গণ্য হবে না। [ফাতহুল বারী]

বলা বাহুল্য যে, নিজের হক রক্ষা করার জন্যই মানুষ মামলা-মোকোদ্দমা করে। যদি সন্তানের নিজের বলে কিছু নাই থাকে বরং তার সব কিছুর প্রকৃত মালিক হয় পিতা আর পিতা চাহিবা মাত্র সে তাকে তা প্রদান করতে বাধ্য থাকে তবে এ ব্যাপারে বিচার প্রার্থী হওয়ার সুযোগ কোথায়?

সুতরাং পুরো সম্পত্তির মালিকানা নয় বরং নিজের প্রয়োজনে সন্তানের সম্পত্তি গ্রহণ করার দিকেই হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই হাদীসের অন্য বর্ণনায় ‘ইয়াজতাহু মালী’ (يجتاح مالي) তথা আমার সম্পত্তি লোপাট করতে চায় এর বদলে বলা হয়েছে ‘ইয়াহতাজু মালী’ (يحتاج مالي) অর্থাৎ আমার সম্পত্তির প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। [আবু দাউদ]

এ থেকে বোঝা যায়, সন্তানের সম্পত্তির প্রতি মুখাপেক্ষী হলে পিতা তা থেকে গ্রহণ করতে পারে। অপচয় বা অবব্যয় করার জন্য নয়।

ইমাম শাওকানী ﷀ বলেন,

فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مُشَارِكٌ لِوَلَدِهِ فِي مَالِهِ، فَيَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ سَوَاءٌ أَذِنَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ، وَيَجُوزُ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهِ كَمَا يَتَصَرَّفُ بِمَالِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّرَفِ وَالسَّفَهِ

এই হাদীস প্রমাণ করে, পিতাও তার সন্তানের সাথে তার সম্পত্তিতে হকদার। সন্তানের

অনুমতি ছাড়াই পিতা তার সম্পত্তি থেকে গ্রহণ করতে পারে। নিজের সম্পত্তি যেভাবে ব্যয় করে সন্তানের সম্পত্তি থেকেও সে (ন্যায় সঙ্গতভাবে) ব্যয় করতে পারে। যদি না অপচয় করে বা বোকামী করে। [নাইলুল আওতার]

আস-সানাদী ﷺ তার হাশিয়াতে বলেন,

عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مَالِكَ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَةِ كَمَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَأَمَّا إِذَا أَرَدْنَا بِهِ إِبَاحَةَ مَالِهِ حَتَّى يَجْتَاحَ وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ لَا عَلَى هَذَا الوَجْهِ، فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ

এর অর্থ হলো, পিতার যখন সম্পদের প্রয়োজন হয় তখন নিজের সম্পত্তির মতোই সন্তানের সম্পত্তি থেকেও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি আমরা বলি এভাবে প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ না করে সন্তানের পুরো সম্পত্তিই সে জবরদখল করতে পারে তবে ফোকাহায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এমন বলেছেন বলে আমি জানি না।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, পিতা-মাতার উপর প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় করতে সন্তান বাধ্য কিন্তু সম্পদ অপচয় করার জন্য বা বোকামীবশত অকারণে ব্যয় করার জন্য পিতা-মাতার হাতে তুলে দিতে সন্তান বাধ্য নয়। বিশেষত যাকাত, স্ত্রী-সন্তান ও দাস-দাসীদের ভরন পোষনের মতো আবশ্যিক বিষয় পরিত্যাগ করে পিতা-মাতার বিলাসিতার পিছনে অর্থ ব্যয় করা নিঃসন্দেহে হারাম হবে। যেহেতু পিতা-মাতার উপর ব্যয় করা সর্বাবস্থায় ফরজ নয় বরং কেবল তখন ফরজ যখন সন্তানের ক্ষমতা থাকে আর পিতা-মাতার প্রয়োজন থাকে।

ইবনে মুনজির ﷺ বলেন,

ونفقة الوالدين تجب في مال الولد وذلك إذا لم يكن لهما مال، وَلَا يرجعان إِلَى كسب يغنيهما

পিতা-মাতার ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের উপর ফরয। এটা তখন যখন তাদের কোনো সম্পদ না থেকে এবং প্রয়োজন মিটানোর মত কোনো আয় উপার্জন না থাকে। [ইকনা]

চার মাযহাবের ওলামাযে কেরামের এটাই মত। ইবনে কুদামা আল হাম্বলী ﷺ পিতা-মাতা ও সন্তানদের উপর ব্যয় করার ব্যধ্যবাধকতা বর্ণনা করার পর বলেন, (إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ) "যদি তারা অভাবী হয় এবং তাদের উপর ব্যয় করার মত সম্পদ তার থাকে।" [মুগনী]

হানাফী ফকিহ ইবনে নুজাইম ﷺ পিতা-মাতার ব্যয় ভার বহন করা প্রসঙ্গে বলেন,

وَشَرَطَ الْفَقْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَا مَالٍ فَإِيجَابُ النَّفَقَةِ فِي مَالِهِ أَوْلَى مِنْ إيجَابِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ حَيْثُ تَجِبُ مَعَ الْغِنَى

এক্ষেত্রে পিতা-মাতা অভাবী হওয়া শর্ত। যেহেতু তাদের কোনো সম্পদ থাকলে সন্তানের সম্পদে তাদের ব্যয়ভার আবশ্যক করার চেয়ে তাদের নিজেদের সম্পদে নিজেদের ব্যয়ভার আবশ্যক করা অধিক যৌতিক। স্ত্রীর বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। যেহেতু সে ধনী হলেও তার ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর আবশ্যক। [বাহরে রায়েক]

ইমাম মালেক ﵀ বলেন,

يُنْفَقُ عَلَيْهِمَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَأَبَوَاهُ مُعْسِرَانِ

সন্তান ছোট হোক আর বড় হোক তার সম্পদ থেকে পিতা-মাতার ব্যয় ভার বহন করতে হবে। যদি তার কোনো সম্পদ থাকে এবং তার পিতা মাতা অভাবী হয়।

[মুদাওওয়ানা]

শাফেয়ী মাযহাবের ফকিহ আল মাওয়ারদী ﵀ বলেন,

وعَلى الرجل الْمُوسر أَن ينْفق على وَالِديهِ إِذا كَانُوا فُقَرَاء زمنى

সচ্ছল ব্যাক্তির উপর তার বাবা-মায়ের খরচ বহন করা আবশ্যক যদি তারা অভাবী হয় এবং আয় উপার্জন করতে অক্ষম হয়। [ইকনা]

দেখা যাচ্ছে, পিতা-মাতা ধনী হলে বা তাদের আয় উপার্জনের ব্যবস্থা থাকলে তাদের উপর ব্যয় করা আবশ্যক নয়। এব্যাপারে মোটামুটিভাবে সকল আলেম একমত। বিপরীতে স্ত্রীর উপর ব্যয় করা ফরয যদিও সে ধনী হয়। যেমনটি হানাফী ফকিহ ইবনে নুজাইমের উপরের বক্তব্যে এসেছে। অন্য স্থানে তিনি বলেন,

لَوْ كَانَ لَهَا أَمْتِعَةٌ مِنْ فُرُشٍ وَنَحْوِهَا لَا يَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ ذَلِكَ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا أَمْتِعَةٌ فَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَلْبَسَ مَتَاعَهَا وَلَا أَنْ تَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا

যদি স্ত্রীর নিজের কিছু কাপড় চোপড় বা জিনিষপত্র থাকে তবে স্বামী সেসবের ব্যয়ভার বহর করা হতে নিষ্কৃতি পাবে না। বরং তার উপর পুর্বে আমরা যা বলেছি সেসব দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক হবে। স্ত্রীর কিছু বিছানা পত্র থাকলে সে নিজের বিছানায় শয়ন করতে বাধ্য নয়। [বাহরে রায়েক]

পরে তিনি বলেন,

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا تَسْلِيمُ نَفْسِهَا فِي بَيْتِهِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ مَا يَكْفِيهَا بِحَسَبِ حَالِهِمَا مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلُبْسٍ وَفُرُشٍ وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِمَا هُوَ مِلْكُهَا وَلَا أَنْ تَفْرِشَ لَهُ شَيْئًا مِنْ فِرَاشِهَا وَإِنَّمَا أَكْثَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ تَنْبِيهًا لِلْأَزْوَاجِ لِمَا نَرَاهُ فِي زَمَانِنَا مِنْ تَقْصِيرِهِمْ فِي حُقُوقِهِنَّ حَتَّى أَنَّهُ يَأْمُرَهَا بِفَرْشِ أَمْتِعَتِهَا جَبْرًا عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ لِأَضْيَافِهِ وَبَعْضُهُمْ لَا يُعْطِي لَهَا كِسْوَةً حَتَّى كَانَتْ عِنْدَ الدُّخُولِ غَنِيَّةً صَارَتْ فَقِيرَةً، وَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ، نَعُوذُ بِاللَّهِ

মোদ্দা কথা হলো, একজন মহিলার উপর স্বামীর সামনে নিজেকে পেশ করা ছাড়া অন্য কিছুই আবশ্যক নয়। কিন্তু স্বামীর উপর তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক-আশাক, বিছানা-পত্র ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয়ভার সাধ্যমত বহন করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীর কোনো কাপড়-চোপড় বা বিছানাপত্র থাকে তবে সে তা ব্যবহার করতে বাধ্য নয়। স্বামীর জন্য তা বিছিয়ে দিতেও বাধ্য নয়। এ বিষয়ে আমরা এতো বেশি আলোচনা করলাম যাতে স্বামীরা সতর্ক হয়। বর্তমান সময়ে আমরা দেখছি, স্বামীরা স্ত্রীদের হক আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি করছে। এমনকি সে তার (স্ত্রীর) বিছানা-পত্র নিজের জন্য বা তার মেহমানদের জন্য বিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে এবং তা করতে বাধ্য করছে। কেউ কেউ তো স্ত্রীকে প্রয়োজন পরিমান পোশাক-আশাক কিনে দেয় না। ফলে দেখা যায় স্ত্রী বিবাহের সময় ধনী ছিলো কিন্তু বিবাহের পর (নিজের খরচ নিজে বহন করে) দরিদ্র হয়ে গেছে। এসবই হারাম এবং অবৈধ কাজ। নাউজু বিল্লাহ।

ইমাম শাফেয়ী ﵀ বলেন,

وَيُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً

একজন স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করবে যদিও স্ত্রী ধনী হয়। [আল উম]

মালেকী মাযহাবের ফকীহ আল কয়রাওয়ানী ﵀ তার রিসালাতে বলেন,

ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن

কোনো ব্যক্তির উপর অন্য কারও ব্যয়ভার বহর করা আবশ্যক নয়। কেবল তার স্ত্রী, সে (স্ত্রী) ধনী হোক বা গরীব হোক, তার গরীব পিতা-মাতা এবং ছোট সন্তান ছাড়া। যাদের কোনো সম্পদ নেই। ছেলে হলে বালেগ ও কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আর মেয়ে হলে বিয়ে হয়ে স্বামীর বাড়ি না যাওয়া পর্যন্ত।

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ আল বুহুতী ﵀ স্ত্রীর ভরন পোষন বহন করার আলোচনা

প্রসঙ্গে বলেন, (وَسَوَاءٌ كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً) "এ ক্ষেত্রে স্ত্রী ধনী বা গরীব যাই হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই।" [শারহে মুনতাহা]

এখন, যে ব্যক্তির পিতা-মাতা অভাবী নয় তার উপর তাদের খরচ বহন করা আবশ্যক নয়। কিন্তু তার স্ত্রী এবং ছোট সন্তানদের খরচ বহন করা তার উপর আবশ্যক। এমতাবস্থায় যদি সে সকল সম্পত্তি পিতা-মাতার হাতে অর্পন করে আর তারা তার স্ত্রী সন্তানদের ভরন পোষনে ত্রুটি করে তবে তাদের হক নষ্ট করার কারণে সে যে পাপী হবে তার নিসন্দেহ বলা যায়। তাছাড়া এটা আল্লাহর রসুলের নির্দেশের বিপরীত হবে। যেহেতু তিনি বলেন, (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) "যাদের ভরনপোষনের দায়িত্ব তোমার উপর তাদের উপর আগে ব্যয় কর।" [বুখারী ও মুসলিম] অন্য একটি গ্রহনযোগ্য বর্ণনায় এসেছে,

وَمَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟, قَالَ: " امْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي, خَادِمُكَ يَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي, وَلَدُكَ يَقُولُ: إِلَى مَنْ تَتْرُكُنِي

বলা হলো, হে আল্লাহর রসুল, কার ভরনপোষন আমার উপর দায়িত্ব? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর। সে বলবে, হয়তো আমার খাবার দাও, নয়তো তালাক দাও। আর তোমার দাস বা দাসীর। সে বলবে, আমাকে খাবার দিন বা কোনো কাজে নিয়োগ করুন। আর তোমার সন্তানদের। তারা বলবে, আমাদের কোথায় ফেলে দেবেন? [দারে কুতনী]

বাবা-মা অভাবী হলে বা অক্ষম হলে তারও নিসন্দেহে এর মধ্যে পড়বে যেহেতু তাদের ব্যয়ভার বহন করাও তখন আবশ্যক হবে। যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু বাবা-মার অধিকারের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে তাদের উপর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যয় করে স্ত্রী-সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নিসন্দেহে পাপের কাজ। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হলো স্ত্রী সন্তানদের ভরনপোষন নিজে হাতে না করে বাবা-মার হাতে ছেড়ে দেওয়া। সেক্ষেত্রে মা সাধারণত স্ত্রীকে তিপ্তি করে খেতে পর্যন্ত দেয় না। মাংশের ক্ষেত্রে হাড় চামড়া আর মাছের ক্ষেত্রে লেজটাই চিরকাল তার সঙ্গী হয়ে থাকে। স্ত্রীর উপর এহেনো জুলুম নির্যাতন করার পরও স্বামী লজ্জা পাওয়ার পরিবর্তে পিতা-মাতার হক আদায় করছি মনে করে গর্ববোধ করে। বলাবাহুল্য যে, এতে গর্বের কিছু নেই বরং এটা স্বামীর অক্ষমতা ও অযোগ্যতারই প্রমাণ বহন করে।

বিবাহ করা বা না করার ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য

বর্তমানে দেখা যায়, অনেক ছেলে-মেয়ে বিয়ের বয়স হয়ে যাওয়া সত্বেও বাবা-মা অকারণে বিয়ে দিতে দেরি করে। এর ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে-মেয়েরা দ্বীন ঈমানের ঘাটতি ও চারিত্রিক ক্ষয়ক্ষতির শিকারে পরিনত হয়। অনেক সময় পিতা-মাতা ছেলে বা মেয়ের মতামতের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের পছন্দ মত পাত্র বা পাত্রীর সাথে জোর করে বিবাহ দিয়ে দেয়। অথবা ছেলে-মেয়েদের পছন্দমত স্থানে বিবাহ করা হতে জোর করে বিরত রাখে। ফলে পরবর্তী জীবনে তাদের অনেক ভুগান্তি পোহাতে হয়। অনেক আলেম ওলামা এসব ব্যপারে একচেটিয়া বাবা-মায়ের পক্ষে কথা বলেন। বাবা-মা সন্তানের ভালই চান, বাবা-মার নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ ইত্যাদি সান্তনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তারা। ক্ষেত্র বিশেষে এসব কথা নিসন্দেহে সঠিক এবং সেক্ষেত্রে পিতা-মাতার সিদ্ধান্ত মেনে চলা অবশ্যই উত্তম। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর বিপরীতও ঘটতে দেখা যায়। অনেক সময় পিতা-মাতা মেয়ের বাবার ধনসম্পত্তির দিকে দৃষ্টি রেখে লোভের বশে পড়ে মেয়ের চরিত্র, চেহারা বা দ্বীন ঈমানের দিকে খেয়াল না রেখে ছেলের বিবাহ দিয়ে থাকেন। মেয়ের বাবা-মাও চাকুরী বা টাকার বহর দেখে বেনামাযী ও চরিত্রহীন ছেলের সাথে মেয়ের বিবাহ দিয়ে থাকেন। এরাও যে ছেলে-মেয়ের ভালো চাননা তা নয়। তবে ভালো যে কিসে তাই বোঝেন না। এদের চিন্তা ভাবনাই লোভ ও বোকামীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তার অনুসরণ করলে বরকত হওয়ার পরিবর্তে দোজাহানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উপরে পিতা-মাতার আনুগত্য সম্পর্কে যে মূলনীতি আমরা বর্ণনা করেছি তার আলোকে চিন্তা করলে স্পষ্ট প্রমানীত হবে এসব বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য করা সন্তানের উপর আবশ্যিক নয়। যেহেতু একদিকে তা তার জন্য ক্ষতিকর অপরদিকে পিতা-মাতার পক্ষ থেকে এসব আদেশ-নিষেধের যৌতিক কোনো কারণ নেই। কেবল অজ্ঞতা ও বোকামী ছাড়া। অতএব পিতা-মাতার কথা শুনে বিয়ে না করে হারামে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে বা তাদের কথা অনুযায়ী বিবাহ করলে চিরকাল অশান্তিতে ভোগার সম্ভাবনা থাকলে সন্তান তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য নয়। ইবনে মুফলিহ ﵀ বলেন,

إِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَالِدَاهُ يَمْنَعَانِهِ مِنْ التَّزَوُّجِ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ

যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে তবে তার পিতা-মাতা তাকে বিবাহ থেকে নিষেধ করার কোনো অধিকার রাখে না। [আদাবে শারইয়্যাহ]

তিনি আরো বলেন,

لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَإِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةٌ سَاعَةً وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ تُؤْذِي صَاحِبَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ فِرَاقُهُ

সন্তান যাকে পছন্দ করে না তার সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করার অধিকার পিতা-মাতার নেই। এক্ষেত্রে এমন নির্দেশ অমান্য করলে সন্তান অবাধ্য বলে গন্য হবে না। অপছন্দনীয় খাবারই যখন কেউ কাউকে বাধ্য করতে পারে না। তখন বিবাহের ব্যপারে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। যেহেতু অপছন্দনীয় খাবারে তিক্ততা অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। কিন্তু অপছন্দনীয় ব্যক্তির সাথে যে বিবাহ করে সে দীর্ঘ কাল কষ্ট ভোগ করে। অনেক সময় (সারাজীবনে) তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

[আদাবে শারইয়্যাহ]

বিভিন্ন হাদীস থেকে এ ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

ছায়্যেব (বিধবা বা তালকপ্রাপ্তা) মহিলা নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশি হকদার (অর্থাৎ সে নিজেই পাত্র সন্ধান করে বিবাহ করতে পারে)। আর অবিবাহিত কুমারী মেয়ের ক্ষেত্রে (যেহেতু লজ্জার কারণে নিজেই পাত্র সন্ধান করতে পারে না) তার পিতা (পাত্র সন্ধান করবে কিন্তু বিয়ের পূর্বে) তার অনুমতি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে চুপ থাকাই অনুমতি প্রদান বলে গণ্য হবে। [মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ কে বলা হলো, (إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي؟ قَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا») "কুমারী মেয়ে তো (বিয়ের ব্যাপারে মতামত দিতে) লজ্জা পায়। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার ক্ষেত্রে চুপ থাকাই সম্মতি বলে গণ্য হবে।" [বুখারী]

এসব হাদীস প্রমাণ করে, পিতা তার কন্যাকে ইচ্ছা মতো যে কারো সাথে বিবাহ দিতে পারে না। এক্ষেত্রে কন্যার সম্মতি থাকা জরুরী। অন্যান্য হাদীসে এসেছে, এমনকি পিতা যদি কন্যার সম্মতি ছাড়াই বিবাহ দিয়ে ফেলে তবে সে বিবাহ বাতিল হবে।

খনসা নামক এক মহিলা সাহাবী বলেন,

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

তার বাবা তার অপছন্দ সত্ত্বেও বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তখন ছায়্যেব (বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা)। পরে তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে অভিযোগ করলে রসুলুল্লাহ ﷺ সে বিয়ে বাতিল করে দেন। [বুখারী]

ইবনে বাত্তাল ﵀ বলেন,

اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد

বিভিন্ন এলাকার ফোকাহায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, ছায়্যেব মহিলার পিতা যদি তার সম্মতি গ্রহণ না করেই কোথাও বিবাহ দিয়ে দেয় তবে তা অবৈধ হবে এবং সে বিবাহ বাতিল হবে। [শারহে বুখারী]

অন্য হাদীসে এসেছে,

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

একজন কুমারী মেয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে এসে বলল, তার বাবা তার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহ দিয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ বহাল রাখার বা বিবাহ বাতিল করার ইখতিয়ার প্রদান করেন। [আবু দাউদ, হাদীসটির সনদ সহীহ]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একটি মেয়ে এমন অভিযোগ করলে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ বহাল রাখা বা বাতিল করে দেওয়ার ইখতিয়ার প্রদান করেন। তখন সে বলে,

قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

আমার বাবা যা করেছে আমি তা মেনে নিলাম। আমি কেবল এটা প্রমাণ করলাম যে, এ ব্যাপারটি পিতাদের হাতে নয়। [ইবনে মাযা, এর সনদ সহীহ]

উপরের হাদীসের ব্যাখ্যায় আওনুল মা'বুদে বলেন,

فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِجْبَارِ لِلْأَبِ لِابْنَتِهِ الْبِكْرِ عَلَى النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ بِالْأَوْلَى

এই হাদীস প্রমাণ করে, অন্য অভিভাবকরা তো নয়ই এমনকি পিতাও তার কুমারী কন্যাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে না। [আওনুল মা'বুদ]

এরপর তিনি বলেন, হানাফী মাজহাবের এটাই মত আর ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদের মত হলো কেবল পিতা তার কন্যাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে। উপরোক্ত হাদীসের

কারণে পরবর্তীতে তিনি হানাফী মাজহাবের মতটিকেই সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সম্মতি ছাড়া মেয়েদের বিবাহ না দেওয়ার ব্যাপারে হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকার কারণে এবং উপরে উল্লেখিত ঘটনার কারণে এই মতটিই সঠিক প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীসে একই সাথে দুটি শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমটি হলো, বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সন্তানের হাতে। পিতা তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দিতে পারে না। আর দ্বিতীয়টি হলো, বিশেষ সমস্যা মনে না করলে সন্তানের উচিৎ পিতার সিদ্ধান্তের উপর বহাল থাকা। তবে যদি তার মনে হয় পিতা-মাতার সিদ্ধান্তের উপর আমল করলে ভবিষ্যত জীবনে তার কোনো সমস্যা হবে তাহলে সে তাদের সিদ্ধান্ত অমান্য করতে পারে।

যেমন অন্য একটি হাদীসে এসেছে, একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমার মেয়ে বিবাহ করতে চাচ্ছে না। রসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে বললেন, (أطيعي أباك) "তোমার পিতার আনুগত্য করো"। উক্ত মহিলা তখন স্বামীর অধিকার কি সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলে উক্ত মহিলা বুঝতে পারলো তার পক্ষে এসব হক আদায় করে চলা সম্ভব নয়। তাই সে বলল, আল্লাহর কসম, আমি কখনও বিবাহ করবো না। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, (لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ) "মেয়েদের ইচ্ছার বাইরে তাদের বিবাহ দিয়ো না"। হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতে হাসান সনদে বর্ণিত আছে।

দেখা যাচ্ছে, রসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে এই মহিলাকে পিতার আনুগত্য করার কথা বলেছেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন সে বিবাহ না করার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তখন তিনি উল্টো পিতাকেই বলেছেন, জোর করে মেয়েদের বিবাহ দিয়ো না। এ থেকে ঐ একই বিষয় প্রমাণিত হয়। তা হলো, বিবাহ একটি ব্যক্তিগত বিষয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সন্তানের হাতে। পিতা তাকে বাধ্য করতে পারে না। তবে সন্তানের উচিৎ কোনো সমস্যা মনে না করলে পিতার কথা মেনে চলা। তবে নিজের উপর কষ্টকর মনে করলে সে পিতার সিদ্ধান্ত অমান্যও করতে পারে।

এটা হলো মেয়ে সন্তানের ব্যাপারে। ছেলে সন্তান সাবালেগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হলে বিয়ের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই যে চুড়ান্ড সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। অতএব বিবাহের ব্যাপারে তার অবস্থাও উপরে যা বলা হলো তার ব্যতিক্রম নয়। প্রয়োজন মনে করলে

ছেলে নিজেই বিবাহ করে ফেলতে পারে যদিও তার পিতা-মাতা তাকে বিবাহ করতে নিষেধ করে। যেহেতু স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ সক্ষম যুবকদের বিবাহ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ওহে যুবকরা, তোমাদের মধ্যে যে কেউ বিবাহ করতে সক্ষম সে যেনো বিবাহ করে ফেলে। [বুখারী]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

আমি নারীদের সাথে বিবাহ করি। যে কেউ আমার সুন্নাত থেকে দূরে সরে যায় সে আমার কেউ না। [বুখারী ও মুসলিম]

এসব দলীল প্রমাণের কারণে সকল আলেম একমত যে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কোনো আলেম বিবাহকে এমনকি ফরজ পর্যন্ত বলেছেন। তবে বেশিরভাগ আলেমের মতে বিবাহ করা ফরজ নয় বরং সুন্নাত। তবে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা ফরজ হয়ে যায়। [আল-মুগনী]

এখন অনেকে বলতে পারে, পিতা-মাতা যদি বিবাহ করতে নিষেধ করে আর বিবাহ না করলে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তবে সন্তানের উচিৎ বিবাহ না করা। যেহেতু এক্ষেত্রে বিবাহ করা ফরজ নয়। কিন্তু পিতা-মাতার নির্দেশ মান্য করা ফরজ। বাহ্যিকভাবে এই যুক্তি সঠিক মনে হলেও একটু গভীরে প্রবেশ করলে এটা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। যেহেতু পিতা-মাতা কোনো কারণ ছাড়াই সুন্নাত, মুস্তাহাব বা মুবাহ কাজ থেকে নিষেধ করলেই তা পরিত্যাগ করতে হবে এটা সঠিক বুঝ নয়। উপরে আমরা বলেছি, পিতা-মাতার অযৌক্তিক নির্দেশ মেনে চলতে সন্তান বাধ্য নয়। একারণে পিতা মাতার নির্দেশ ছাড়াই জ্ঞান অর্জন বা ব্যাবসার জন্য সফর করা অবৈধ নয়। পিতা-মাতা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে-পরে যে সুন্নাত নামাজ আদায় করা হয় সেগুলো করতে বারণ করলে বা কুরআন তেলোয়াত করতে নিষেধ করলে সন্তান তা মেনে চলতে বাধ্য নয়।

ইমাম বুখারী رحمه الله উল্লেখ করেন, হাছান বসরী رحمه الله বলেন,

إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا

যদি মা সন্তানের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এশার নামাজ জামাতে আদায় করতে নিষেধ করে তবে সে তার কথা শুনবে না। [সহীহ বুখারী]

বেশিরভাগ আলেমের মতে, জামাতে নামাজ পড়া সুন্নাত,ফরজ নয়।

ইবনে মুফলিহ رحمه الله আবুল বারাকাত رحمه الله থেকে উল্লেখ করেন, (أَنَّ الْوَالِدَ لَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ وَلَدِهِ مِنْ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ) "পিতার জন্য সন্তানকে ফরজ নামাজের আগে-পরে যে নিয়মিত সুন্নাত নামাজ আদায় করা হয় তা থেকে নিষেধ করতে পারেন না"।

তিনি আরো উল্লেখ করেন,

لَا يُطِيعُهُمَا فِي تَرْكِ نَفْلٍ مُؤَكَّدٍ كَطَلَبِ عِلْمٍ لَا يَضُرُّهُمَا بِهِ وَتَطْلِيقِ زَوْجَةٍ بِرَأْيٍ مُجَرَّدٍ

গুরুত্বপুর্ণ নফল ইবাদত পরিত্যাগ করার ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করবে না। যেমন পিতা-মাতার ক্ষতি করে না এমনভাবে জ্ঞান অর্জন করা। যৌক্তিক কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া। [আদাবে শারইয়্যঅহ]

বিবাহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই প্রমাণিত হবে ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। বিবাহ না করা দ্বীনের দিক থেকে যেমন কমতি দুনিয়ার দিক থেকেও কমতি।

কোনো একজন ব্যক্তিকে উমর رضي الله عنه বলেছিলেন,

مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

হয়তো তুমি অক্ষম অথবা জেনাকারী। তা না হলে, তুমি বিবাহ করছো না কেনো।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী তউস رحمه الله অন্য এক রাবী মায়সারাকে বলেছিলেন, (لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ) "হয়তো তুমি বিবাহ করবে নতুবা উমর যা বলেছিল আমি তোমাকে তাই বলবো। [মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা]

আহমাদ ইবনে হাম্বাল رحمه الله বলেন,

لَيْسَتْ الْعُزْبَةُ مِنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ، فِي شَيْءٍ. وَقَالَ: مَنْ دَعَاكَ إِلَى غَيْرِ التَّزْوِيجِ، فَقَدْ دَعَاكَ إِلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ

বিয়ে না করে বসে থাকা ইসলামের সংস্কৃতি নয়। যে কেউ বিবাহ না করার দিকে আহ্বান করে সে ইসলামের বিপরীত দিকে আহ্বান করে। [আল-মুগনী]

এসব শিক্ষাকে অমান্য করে যে পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের আধা বয়স পর্যন্ত বিবাহ থেকে বিরত রাখতে চায় তাদের নির্দেশ মেনে নেওয়া অর্থ ইসলামের শিক্ষা থেকেই সরে আসা এবং অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রচলন ঘটতে সহায়তা করা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ প্রদান করুন।

স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য

উপরে আমরা দেখেছি বিবাহ একটি ব্যক্তিগত বিষয়। নিজের বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সন্তানের রয়েছে। পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী কাউকে বিবাহ করতে বা কাউকে বিবাহ না করতে সে বাধ্য নয়। বলা বাহুল্য যে, তালাকের বিষয়টিও অনুরুপ। বরং এ বিষয়ে পিতা-মাতার সিদ্ধান্ত না মানাটা আরো বেশি যৌক্তিক। যেহেতু তালাকের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর আর্থিক ও নৈতিক অনেক ক্ষয়ক্ষতি জড়িয়ে আছে। অতএব, স্ত্রী স্বামীর পছন্দমতো হওয়া স্বত্ত্বেও কেবলমাত্র পিতা-মাতার নির্দেশের কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সঠিক নয়। ইবনে মুফলিহ ﷬ বলেন,

وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ تَأْمُرُهُ أُمُّهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّهَا وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا

শায়েখ তাকীউদ্দিন বলেছেন, যদি কারো মা তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে তবে তার জন্য তালাক দেওয়া বৈধ হবে না। বরং তার উপর দায়িত্ব হলো, মায়ের সাথে সদাচারণ করা। আর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সাথে মায়ের সাথে সদাচারণ করার কোনো সম্পর্ক নেই। [আদাবে শারয়িয়্যাহ]

আল-মুরুযী ﷬ উল্লেখ করেন, আতা ﷬ এর নিকট এক ব্যাক্তি এসে বলল, আমার মা আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, মায়ের সাথে ভাল আচরণ করো। আর স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না। উক্ত ব্যক্তি বলল, কিন্তু আমার মা তো এ ছাড়া সন্তুষ্ট হবে না। তিনি বললেন, (**فَلا أَرْضَاهَا اللَّهُ، امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ إِنْ طَلَّقَهَا فَلا حَرَجَ وَإِنْ حَبَسَهَا فَلا حَرَجَ**) "আল্লাহ তার সুবুদ্ধি দিক। সন্তানের স্ত্রীর ব্যাপারটি তারই হাতে সে প্রয়োজন মনে করলে তাকে তালাক দেবে তা না হলে তাকে কাছে রাখবে এতে কোনো সমস্যা

নেই।” [আল-বির ওয়াস সিলা]

তিনি আরো উল্লেখ করেন, হাসান বসরী ﵀ বলেছেন, (لَيْسَ الطَّلَاقُ مِنْ بِرِّهَا فِي شَيْءٍ) “স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সাথে মায়ের সাথে সদাচরণের কোনো সম্পর্ক নেই।”

[আল বির ওয়াস সিলা]

তবে একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে, তার পিতা উমর ﵁ তার এক স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে তিনি অস্বীকার করেন। পরে উমর ﵁ রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে অভিযোগ করলে রসুলুল্লাহ ﷺ ইবনে উমরকে বলেন, (طلقها) “তাকে তালাক দিয়ে দাও”। ফলে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

[আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ]

এই হাদীসের কারণে অনেকে মনে করেছে, পিতা-মাতা নির্দেশ দিলে অকারণেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সন্তানের উপর ফরজ হবে। তুহাফাতুল আহওয়াজিতে আল-মোবারোকপুরী একথাই বলেছেন। প্রশ্ন হলো, উমর ﵁ কি এই ঘটনায় তার পুত্র বধুকে অকারণেই তালাক দিতে বলেছেন? উমর ﵁ এর ব্যপারে কি এমন ধারণা করা যায়? আর যদি এমন হতোই তবে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ কি বিনা বাক্যে এটা মেনে নিতেন? তিনি কি একবারের জন্যও উমর ﵁ কে বোঝানোর চেষ্টা করতেন না যে, অকারণে তালাক দেওয়ার দরকার কি? আল্লাহ ও তার রসুল কি সংসার গড়তে চান নাকি ভাঙতে চান? বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের উপর চিন্তা করলে সহজেই এর উত্তর লাভ করা সম্ভব। মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ হলে করনীয় সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেন, (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) “মিমাংশা করে নেওয়াই উত্তম।” [নিসা/১২৮] ইমাম বাইদাবী ﵀ বলেন, (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ من الفرقة أو سوء العشرة أو من الخصومة.) “তালাক নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, বা ঝগড়া বিবাদ করার চেয়ে মিমাংশা করে নেওয়া উত্তম।” এছাড়া অন্য আয়াতে জাদুর অনিষ্টতা বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, (يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) “জাদুর মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতো”। [বাকারা/১০২] দেখা যাচ্ছে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে অকারণে পৃথক করে দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অনুত্তম কাজ। বিশেষত, যখন স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ভালবাসে কিন্তু তৃতীয় পক্ষ তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। এখন একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, উমর ﵁ অকারণেই

একাজ করেছেন আর রসুলুল্লাহ ﷺ তার পক্ষাবলম্বন করেছেন! উক্ত মহিলাকে তালাক দেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ আছে কিনা সে বিষয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ কি একবারও চিন্তা করবেন না? এবং তাদের মাঝে মিমাংসা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না? অথচ তিনিই বলেছেন, (إصلاح ذات البين) তথা মানুষের মাঝে মিমাংশা করে দেওয়া নফল সলাত, সওম ও সদাকার চেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ। [আবু দাউদ, সহীহ] তাছাড়া তালাকের নিন্দা প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। তার মধ্যে প্রশিদ্ধ হলো, (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ) "হালাল কাজের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত হলো তালাক।" [আবু দাউদ] হাদীসটির বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে কিছু সহীহ। তবে অনেক মুহাদ্দিসের মতে হাদীসটি মূলত মুরসাল। একারণে একদল ফোকাহায়ে কিরাম এই হাদীস থেকে অকারণে তালাককে অপছন্দ করার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। শরীয়তের স্বাভাবিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিলেও তেমনটাই প্রমাণিত হয়। এখন যারা মনে করেন উপরের হাদীসে উমর رضي الله عنه অকারণে পুত্রবধুর তালাক দিতে বলেছেন আর রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সমর্থন করেছেন তাদের এই বুঝ সঠিক মনে হয় কি? সাধারণ বুদ্ধিতেই এটা প্রমাণিত হয় যে, একেবারে অকারণে তালাক দিতে চাইলে রসুলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই উমর رضي الله عنه কে নিষেধ করতেন বা কমপক্ষে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, উক্ত মহিলাকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে যৌক্তিক কোনো কারণ অবশ্যই ছিলো। রসুলুল্লাহ ﷺ সেটা হয়তো জানতেন বা উমর رضي الله عنه এর উপর তার অগাধ আস্থা ছিলো তাই ধরেই নিয়েছেন উমর যখন তার তালাক চাচ্ছে তখন কারণ তো একটা অবশ্যই আছে। একারণেই তিনি তাকে সমর্থন করেছেন। এভাবে চিন্তা করলে বর্তমানে যে কোনো পিতা-মাতার উপর এই হাদীসের বিধান প্রয়োগ করার চেষ্টা করা সঠিক হতে পারে না। ইমাম শাওকানী বা অন্যান্য জাহেরী দৃষ্টিভঙ্গির আলেমরা এই সুক্ষ্ম বিষয়টি ভুলে গেলেও ফোকাহায়ে কেরাম তা স্মরণ রেখেছেন। তাই তো তারা পিতা-মাতার নির্দেশে বিনা-বাক্যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মত গ্রহণ করেননি।

ইবনে মুফলিহ رحمه الله বলেন,

سَأَلَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي قَالَ: لَا تُطَلِّقْهَا قَالَ: أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ حَتَّى يَكُونَ أَبُوكَ مِثْلَ عُمَرَ

একজন ব্যাক্তি আহমাদ ইবনে হাম্বালকে প্রশ্ন করলো, আমার পিতা আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ো না। সে বলল, উমর ﷺ তো তার পুত্রকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলো (আর রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সমর্থন করেছেন)। তিনি বললেন, তোমার বাবাও যদি উমরের মতো হয়ে থাকে তবে তুমিও তাই করো। [আল-আদাব আশ-শারয়ীয়্যঅহ]

ইবনে মুফলিহ অন্যস্থানে বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﷺ বলেছেন, (أُمِّهِ فَإِنْ أَمَرَهُ الْأَبُ بِالطَّلَاقِ طَلَّقَ إِذَا كَانَ عَدْلًا) "যদি কারো পিতা তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে তবে সে তাই করবে যদি পিতা ন্যায়পরায়ন হয়"। [আল-আদাব আশ-শারয়ীয়্যাহ]

অন্য একটি হাদীসে এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে এসেছে, এক দাস রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমার মনীব আমাকে তারই এক দাসীর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। কিন্তু এখন আমাদের মাঝে পৃথক করে দিতে চাচ্ছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষনাৎ মিম্বারে উঠে বক্তব্য দিলেন এবং বললেন,

مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি নিজের দাসকে তারই কোনো দাসীর সাথে বিবাহ দিয়ে পরে আবার তাদের বিচ্ছিন্ন করতে চায় কেনো? তালাক দেওয়ার অধিকার কেবল তার যে উক্ত নারীর শরীর স্পর্শ করতে পারে (অর্থাৎ তার স্বামীর)। [ইবনে মাযা]

এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাওকানী ﷺ বলেন, (وَطُرُقُهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا) এই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা একটিকে অন্যটি শক্ত করে।

[নাইলুল আওতার]

এখানে দেখা যাচ্ছে, দুজন দাস ও দাসীর মনীব তাদের বিবাহ ভেঙে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ তাতে বাধা দিয়েছেন। জানা কথা যে, সন্তানের উপর পিতার যতটা হক দাসের উপর তার মনিবের হক তার চেয়ে বেশি। যেহেতু সে তার কেনা গোলাম এবং হুকুমের অধীন। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক আদায়ের উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে দাসের উপর মনীবের হক আদায় করার গুরুত্বও বর্ণিত আছে বিভিন্ন হাদীসে। এ হিসেবে বলা যায়, কোনো কারণ ছাড়াই কেবল পিতার আদেশে সন্তান তালাক প্রদান করতে বাধ্য হলে মনীবের আদেশে দাসও তালাক দিতে বাধ্য

হওয়া উচিৎ। তাহলে এই হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ মনীবের পক্ষাবলম্বন না করে দাসের পক্ষ নিলেন কেনো? কেনোই বা বললেন, তালাক দেওয়ার অধিকার কেবল স্বামীর। সঠিকভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এই ঘটনায় অন্যায়ভাবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছিলো। তাই রসুলুল্লাহ ﷺ তাতে বাধা দিয়েছেন। এ হিসেবে বলা যায় উমর ﵁ যৌক্তিক কারণেই পুত্রবধুকে তালাক দিতে চেয়েছেন তাই রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সমর্থন করেছেন। অকারণে তালাক দিতে চাইলে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বাধা দিতেন।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। উপরে আমরা বলেছি, সন্তানের ক্ষয়ক্ষতি হয় এমন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য নেই। সংসারিক জীবনে অকারণে নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার চেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি আর কি হতে পারে! এর মাধ্যমে প্রথমত ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করার পিছনে যত টাকা ব্যয় হয়েছে তা পানিতে পড়ে যায় এবং পুনরায় খরচ-খরচা করে বিবাহ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, ঐ স্ত্রীর সাথে যতটা বনিবনা হয়েছিলো পরবর্তী স্ত্রীর সাথে তা হবে কিনা বা পিতার খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করে বিনা কারণে তালাক দেওয়ার কথা শুনে কোনো সম্ভ্রান্ত লোক ঐ ব্যক্তির সাথে মেয়ে বিবাহ দেবে কিনা সেটা নিয়েই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। উপরের মূলনীতির আলোকে প্রমাণিত হয়েছে, আর্থিক ও নৈতিক দিক থেকে এমন ক্ষয়ক্ষতি থাকার কারণে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে পিতার নির্দেশকে অমান্য করার অধিকার সন্তানের রয়েছে।

ইবনে মুফলিহ ﵀ বলেন,

وَتَطْلِيقِ زَوْجَةٍ بِرَأْيِ مُجَرَّدٍ قَالَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَطَلَاقُ زَوْجَتِهِ لِمُجَرَّدِ هَوًى ضَرَرٌ بِهَا وَبِهِ

কোনো কারণ ছাড়াই কেবল খেয়াল খুশির বশবর্তী হয়ে তালাকের নির্দেশ দিলে সন্তান তা মানতে বাধ্য নয়। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (لا ضرر ولا ضرار) "কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না"। [ইবনে মাযা] আর কোনো কারণ ছাড়াই তালাক দেওয়া স্বামী স্ত্রী উভয়ের উপর ক্ষতি। [আদাবে শারয়িয়্যাহ]

একজন ব্যক্তি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকে বলল, আমার একটি দাসী আছে (তার সাথে আমি মিলিত হই)। আমার মা আদেশ করেছেন তাকে বেঁচে ফেলতে হবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﵀ বললনে, (تَتَخَوَّفُ أَنْ تُتْبِعَهَا نَفْسَكَ) "এমন আশঙ্কা আছে কি

যে, বেঁচে ফেলার পর তোমার মন তার কাছে পড়ে থাকবে?” সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে বেঁচো না। উক্ত ব্যক্তি বলল, না বেঁচা পর্যন্ত মা আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন না। তিনি বললেন, (إِنْ خِفْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ) যদি তুমি নিজের ব্যাপারে ভয় করো তবে তোমার মায়ের একথা বলার অধিকার নেই। [আদাবে শারয়িয়্যাহ]

একথার অর্থ হলো, যদি দাসী বেঁচে ফেলার পর মনটা তার কাছে পড়ে থাকবে এমন না হয় তবে মায়ের কথা শুনে তাকে বেঁচে ফেলা উচিৎ। তবে তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হবে এমন আশঙ্কা হলে বেঁচবে না। যেহেতু এর মাধ্যমে সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু স্ত্রী তালাকের ক্ষেত্রে এটা শর্ত নয়। বরং স্ত্রী তালাকের পর তার কথা মনে পড়ে কষ্ট হবে এমন না হলেও পিতা-মাতার কথা শুনে সন্তান স্ত্রী তালাক নাও দিতে পারে। দুটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে ইবনে মুফলিহ ﵀ বলেন,

لِأَنَّ بَيْعَ السُّرِّيَّةِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الثَّمَنَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ مُضِرٌّ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فِي الطَّلَاقِ مَا لَا تُتَّهَمُ فِي بَيْعِ السُّرِّيَّةِ

দাসী বেঁচে ফেলা অপছন্দনীয় বিষয় নয়। তাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতিও নেই। যেহেতু সে বিক্রয় করে তার মূল্য ফেরত পাচ্ছে। কিন্তু তালাকের বিষয়টি এর চেয়ে আলাদা। যেহেতু তাতে দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষয়ক্ষতি হয়। (যেহেতু দ্বীনী দৃষ্টিকোন থেকে তালাক উত্তম জিনিস নয় আর দুনিয়াবী দৃষ্টিকোন থেকে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীর দেনমোহর ও বিবাহের অন্যান্য খরচ-খরচা অকারণে নষ্ট হয় এবং পুনরায় খরচ-খরচা করে বিবাহ করার প্রয়োজন দেখা দেয়)। তাছাড়া তালাক দিলে সমাজের মানুষের নিকট যে বদনামের ভাগি হতে হয় দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সেটা নেই। [আদাবে শারয়িয়্যাহ]

তালাকের মধ্যে এতসব ক্ষয়ক্ষতি থাকা সত্ত্বেও যারা পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী অকারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া বৈধ বলে তাদের বলা উচিৎ পিতা-মাতা সন্তানকে অকারণে কাড়ি কাড়ি টাকা-পয়সা অপচয় করার নির্দেশ দিলে বা মুখে কালি মেখে ও গলায় জুতোর মালা দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরা-ফেরা করার নির্দেশ দিলে সন্তানের তাই করা উচিৎ। যেহেতু তালাকের মধ্যেও সম্পদের অপচয় আর সম্মান বিনষ্ট হওয়ার মতো উপাদান রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, ইসলামের বিধানে এমন হাস্যকর আনুগত্যের কোনো স্থান নেই।

সবিশেষে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব, বিবাহ অর্থ মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

করা আর তালাক মানে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত আর তালাক প্রয়োজন বশত বৈধ। কিন্তু নিসন্দেহে উত্তম জিনিস নয়। আর উপরে আমরা বলেছি, সন্তান পিতার নির্দেশ অনুযায়ী বিবাহ করতে বাধ্য নয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। প্রশ্ন হলো, পিতা-মাতার আদেশে সন্তান যখন বিবাহের মতো উত্তম কাজই করতে বাধ্য নয় তখন পিতার নির্দেশে তালাকের মতো অনুত্তম কাজ করতে সে কেনো বাধ্য হবে? যাকে সে পিতা-মাতার নির্দেশ ছাড়াই বিবাহ করতে পারে পিতা-মাতা নির্দেশ দিলেই তাকে তালাক দিয়ে দিতে হবে বিষয়টা কি দ্বিমুখী হয়ে যায় না?

সুতরাং সঠিক কথা হলো, পিতা মাতা স্ত্রীকে তালাক দিতে বললেই সন্তানের উপর সে আদেশ পালন করা আবশ্যক হবে না। বরং সে চিন্তা করে দেখবে পিতা-মাতার এই নির্দেশের মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা। যদি সে যৌক্তিকতা খুঁজে পায় আর তালাক দিলে কোনো ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে তার উচিৎ হবে পিতা-মাতার কথা শোনা। অন্যথায় তালাক না দেওয়াটাই হবে বুদ্ধির দাবী। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

স্ত্রীর উপর জুলুম নির্যাতের ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য

উপরে আমরা পিতা-মাতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি, সঠিক মতে কোনো কারণ ছাড়াই পিতা-মাতা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলে সন্তান তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য নয়। কয়েকটি হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে কোনো কোনো আলেম অবশ্য এ বিষয়ে দ্বিমত করেছেন। তারা বলেছেন, পিতামাতা নির্দেশ দিলে কোনো কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে হবে। এর উপর ভিত্তি করে বোকা লোকেরা ভাবতে পারে, বাবা-মায়ের কথা শুনে স্ত্রীকে যখন তালাক দেওয়াই বৈধ তখন একটু বকা-ঝকা বা মারধর করতে দোষের কি আছে? এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার কারণেই হয়তো এযুগের দ্বীনদার লোকেরাও পিতা-মাতার কথায় স্ত্রীকে কষ্ট দেয় বা স্ত্রীকে যতটা খুশি জুলুম নির্যাতন করার জন্য মা-বোনদের হাতে তুলে দেয়। তারা ভাবে, তালাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যখন পিতা-মাতার হক রয়েছে তখন বকা-ঝকা ও মারধরের মতো ছোটোখাটো বিষয়ে তো তাদের অধিকার রয়েছেই। ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। ইসলামের দৃষ্টিতে

স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম নয়। কারো কারো মতে এটা মাকরুহ তথা অনুত্তম। আর অন্য একদল আলেমের মতে এটা মুবাহ বা বৈধ কাজ। এমতাবস্থায় পিতা-মাতার কথা শুনে তালাক দেওয়ার পক্ষে যেসব আলেম মত দিয়েছেন তাদের যুক্তি হলো, তালাক দেওয়া যেহেতু হারাম নয় আর পিতা মাতার কথা যেহেতু মেনে চলা ফরজ তাই সন্তানের উচিৎ পিতা-মাতার এই আবদার রক্ষা করা। এখন তালাক না দিয়ে স্ত্রীর উপর নানাভাবে জুলুম নির্যাতন করা কিন্তু মোটেও বৈধ নয়। এটা বড় ধরণের পাপ কাজের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

স্ত্রীকে হয়তো ন্যায়সঙ্গতভাবে ধরে রাখতে হবে অথবা ইনসাফের সাথে বিদাই করে দিতে হবে। [বাক্বারা/২২৯]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

স্ত্রীদের হয়তো উত্তমভাবে ধরে রাখো অথবা উত্তমভাবে পৃথক করে দাও। যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার একটা উপাই বার করে দেবেন। [তালাক/২]

সুতরাং প্রয়োজন মনে করলে যে কোনো সময় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার স্বামীর আছে কিন্তু তালাক না দিয়ে নিজের কাছে রাখতে চাইলে তাকে স্ত্রীর হক আদাই করতেই হবে। সাধারণ অবস্থায় তালাক দেওয়া বড় ধরনের কোনো অপরাধ নয় কিন্তু তালাক না দিয়ে জুলুম-নির্যাতন করতে থাকা মারাত্মক অন্যায়। এভাবে স্ত্রীর হক নষ্ট করলে কিয়ামতের দিন কঠিন বিচারের সম্মখীন হতে হবে।

একটি হাদীসে এসেছে, এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামী হবে। সে তাকে বেধে রেখেছিলো কিন্তু খেতে দেয়নি। ফলে বিড়ালটি মারা গিয়েছিলো। তাকে বলা হবে,

لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا، فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

তুমি বেধে রেখেছো কিন্তু খাবার পানি দাওনি। আবার ছেড়েও দাওনি যাতে সে পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে। [বুখারী]

পরিতাপের বিষয় যে, অনেকে স্ত্রীর সাথে এমনই আচরণ করে থাকে। না তারা স্ত্রীর অধিকারের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে আর না তাকে ছেড়ে দেয় যাতে অন্য কাউকে বিবাহ

করতে পারে।

মোটকথা, অকারণে তালাক দেওয়া অনুত্তম ও অনুচিত কাজ কিন্তু তালাক না দিয়ে ধরে বেধে জুলুম-নির্যাতন করতে থাকা তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক অপরাধ। এটা সুস্পষ্ট পাপের কাজ। তাই এ বিষয়ে পিতা-মাতা বা অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। যেহতু স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এ বিষয়ে কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিমত করতে পারে না।

অনেকে আবার তালাকের বিষয়টি নিয়ে স্ত্রীর সাথে রাজনীতি করে। বাবার বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা না আনলে তালাক দিয়ে দেবো, পিতা-মাতার জুলুম নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য না করলে তালাক দিয়ে দেবো ইত্যাদি হুমকী-ধামকি দিয়ে স্ত্রীর উপর অবিচার করতে থাকে। অনেক মুখোসধারী বুযুর্গ ব্যক্তি নিজে এসব না করলেও তার পিতা-মাতা এসব করে আর সে মুখ বুজে সহ্য করে। এভাবে তারা স্ত্রীর বাবার নিকট থেকে বহু সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে। তেমন কিছু না পেলে শেষে ছেলেকে বলে, বউ তালাক দিয়ে দাও। আর হুজুরের তখন পিতা মাতার কথা শুনে বউ তালাক দেওয়ার হাদীসটা মনে পড়ে যায়। ফলে বিনাবাক্যে মায়ের কথামতো বউ তালাক দিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য যে, এসবই হলো সুস্পষ্ট জুলুম। এই বুযুর্গ বা তার পিতা-মাতা কেউই এই মহাপাপ থেকে রেহাই পেতে পারে না।

পিতা-মাতার পক্ষ থেকে এমন জুলুম মুখ বুজে সহ্য করার ফতোয়া কোনো বুদ্ধিমান লোক দিতে পারে না। কুরআন-হাদীস বা কোনো ফিকহের কিতাবে এমন কথার চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কোনো আলেমের পক্ষে এ বিষয়ে দ্বিমত করা সম্ভব নয়। উল্টো ওলামায়ে কিরামের সুস্পষ্ট ফতোয়া হলো, পিতা-মাতার পক্ষ থেকে জুলুম নির্যাতনের আশঙ্কার কারণে স্ত্রীকে পৃথক বাসস্থানে বসবারে সুযোগ করে দেওয়া স্বামীর উপর ফরজ। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

স্ত্রীকে অতিরিক্ত খেদমত করতে বাধ্য করা

আমাদের সমাজে দুটি বিপরীদ চিন্তাধারার প্রচলন আছে। একদল লোক বিবাহের পর থেকে মাকে মহাশত্রু মনে করে। মায়ের সেবা-যত্ন তো দূরের কথা, মায়ের সাথে দেখা সাক্ষাত পর্যন্ত করে না। সমাজের লোকেরা এই শ্রেণীর লোকদের নিন্দা-মন্দ করে। তবে হাজার নিন্দা-মন্দ সত্ত্বেও এই শ্রেণীর লোকই সমাজে বেশি। অন্য একদল লোক

মা-বাবার খেদমতের ব্যাপারে অত্যাধিক অতিরঞ্জন করে। স্ত্রীকে মা-বাবার হাতে দাসীর মতো ছেড়ে রাখে। দাসী বললেও হয়তো ভুল হবে। যেহেতু দাস-দাসীর সাথে মনীব কেমন আচরণ করবে সে ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

সে যা খায় তাকে তাই খাওয়াবে আর সে যা পরিধান করে তাকে তাই পরাবে। তার উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেবে না। আর দিলেও সহযোগিতা করার জন্য অন্য কাউকে তার সাথে দেবে। [বুখারী ও মুসলিম]

সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে, যেসব পুত্রবধু শাশুড়ির অধীনে আছে তাদের অবস্থা দাস-দাসীদের ব্যাপারে হাদীসে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে হাজারগুণ খারাপ। সারাক্ষন বকুনী আর দাঁত খিচুনি, অকারণে জাত ও বংশ নিয়ে খোটা, খাওয়ার সময় হাড়িল তলানি ও পোশাক আশাকে বেহাল দশা দেখে যে কেউ তাকে বাড়ির কাজের মেয়ে বলেই ভাবতে পারে। এছাড়াও রয়েছে কঠিন সব নিয়ম কানুন। শাশুড়ির জুলুম-নির্যাতনে টু শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না, শাশুড়ির আগে ভাত খাওয়া যাবে না ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায়, পুত্র বধু সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর শাশুড়ি পাড়া বেড়িয়ে বেড়িয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকাল করে দিচ্ছে তবু তার অপেক্ষায় না খেয়ে বসে থাকতে হবে। স্ত্রীকে এভাবে মায়ের শাসনের অধীনে যে পুরুষ রাখে তারাই আবার সমাজে বুযুর্গ হিসেবে গণ্য। এসব স্বামীদের কাছে স্ত্রী কোনো অভিযোগ করলে সে বলে, মা-বাবার উপর আমি কথা বলতে পারবো না বা সমাজে আমার একটা মান সম্মান আছে। তোমাকে নিয়ে আলাদা বাসায় থাকলে আমার বদনাম হবে। এভাবে অতিবুযুর্গী ও সমাজ ঠেকানোর যুক্তিতে তারা অবলিলায় স্ত্রীর হক নষ্ট করেন। দিনের পর দিন স্ত্রীকে বাবা-মায়ের দাসী করেই রাখেন। দুঃখের বিষয় হলো, এতো খেদমত পেয়েও কিন্তু শাশুড়ী সন্তুষ্ট হয় না। সব সময় কোনো না কোনো ত্রুটি বের করে গাল-মন্দ করতে থাকে। পাড়ার লোকের কাছে বদনাম করে। আসলে ছেলের বউকে তারা কেবল দাস-দাসী নয় বরং মানুষ মনে করেন কিনা সেটাই সন্দেহ। নিজের ছেলে বা মেয়ের কাছে যতটুকু অধিকার তারা আবদার করেন ছেলের বউয়ের কাছে আদায় করতে চান তার চেয়ে ঢের বেশি। তারই কারণে হাজার খেদমত করেও ছেলের বউ তাদের কাছে ভাল হতে পারে না। অথচ ইসলামের বিধান মতে, ছেলে মা-বাবার

খেদমত করতে বাধ্য হলেও ছেলের বউ এ কাজে মোটেও বাধ্য নয়। যদি নিজ থেকে সে কিছু করে তবে করতে পারে। এভাবে চিন্তা করলে পুত্রবধু যতটুকু খেদমত করে শাশুড়িরা তাই যথেষ্ট মনে করতো। কিন্তু অপসংস্কৃতির প্রভাবে শাশুড়িরা পুত্রবধুকে নিজেদের দাসীই মনে করে। তাই কতটুকু খেদমত করছে এটা মনে না রেখে কতটুকু ত্রুটি করছে সারাক্ষণ তারই হিসাব-নিকাশ করে। অতি বুযুর্গ ছেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মা-বাবার পক্ষ নিয়ে স্ত্রীকে বকা-ঝকা বা মারধর করে। এভাবে জুলুমের উপর আরো জুলুম চাপিয়ে দেয় নিজ স্ত্রীর উপর। স্বামীর বাড়িতে স্ত্রী কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য সে সম্পর্খে জ্ঞান না থাকর কারণেই এসব অনিয়ম ঘটে। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে, ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে কতটুকু কাজ করতে বাধ্য সেটা জেনে নেওয়া একান্ত আবশ্যক। নিচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

স্ত্রীর উপর স্বামীর বাড়ির কতটুকু কাজ-কর্ম আবশ্যক

প্রথমেই আমাদের এখানে যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত আছে তাতে রান্না-বাড়া করা, কাপড় কাচা, ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ নেই। শশুর-শাশুড়ির খেদমত করার কথাও পাওয়া যায় না কোথাও। উপরে আমরা স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি। সেখানে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছি। পাঠক আরো একবার সেখানে দৃষ্টিপাত করলে এ কথার প্রমাণ পাবেন। হাদীসে কেবল সহবাস ও সহবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে স্বামীর প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সদা সর্বদা স্বামীর কাছাকাছি থাকা এবং তার ডাকে সাড়া দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কেই হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে স্বামীর সম্পদের হেফাজতও করতে বলা হয়েছে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাহির হতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসে স্ত্রীর উপর কেবল এতটুকু দায়িত্বই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একারণে হাম্বালী ও শাফেয়ী মাজহাবের আলেমরা স্ত্রীর উপর এর চেয়ে বেশি দায়িত্ব আবশ্যক বলে মনে করেননি। তাদের মতে বিবাহ যে উদ্দেশ্যে করা হয় তথা সহবাস ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই কেবল স্ত্রী স্বামীর খেদমত করতে বাধ্য। রান্না-বাড়া, ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজ তার উপর বর্তায় না। এগুলো স্বামীর দায়িত্ব। নিজের সাধ্যমতো দাস-দাসী বা চাকর বাকর রেখে সে এসব কাজ সমাধা করবে। তবে স্ত্রীর উচিৎ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরিমিত আকারে যতটুকু না করলেই নয় তা করতে থাকা। যেহেতু একেবারে হাত

গুটিয়ে থাকলে সংসার চলতে পারে না। অর্থাৎ এসব কাজ তার উপর আবশ্যক নয়। তাই স্বামী তাকে এগুলো করতে বাধ্য করতে পারে না। না করলে মারধরও করতে পারে না। তবে স্ত্রীর উচিৎ নিজ দায়িত্বে সাধ্যমত কাজ করা। পুরোপুরি হাত গুটিয়ে বসে না থাকা।

ইমাম নাব্বী ﷺ বলেন,

وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْئَانِ تَمْكِينُهَا زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا وَمُلَازَمَةُ بَيْتِهِ قَوْلُهَا

মেয়েদের উপর ওয়াজিব হলো দুটি বিষয়। স্বামীর নিকট নিজেকে অর্পন করা আর সদা সর্বদা তার বাড়িতে অবস্থান করা। [শারহে মুসলিম]

শাফেয়ী মাজহাবের ফিকাহ গ্রন্থ আল মুহাজ্জাবে এসেছে,

ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليها من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه

স্ত্রীর উপর রুটি বানানো, আটা পিশা, রান্না করা এবং অন্যান্য খেদমত আবাশ্যক নয়। যেহেতু তার দিক থেকে কেবল (সহবাস ও অন্যান্য) উপভোগের বিষয়টিই বিবাহের চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। অতএব তা ছাড়া অন্য কিছু তার উপর আবশ্যক নয়।

রওদাতে এসেছে,

فَأَمَّا الطَّبْخُ وَالْكَنْسُ وَالْغَسْلُ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى خَادِمِهَا، بَلْ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ شَاءَ، فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ بِغَيْرِهِ

রান্না-বাড়া, ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ স্ত্রীর উপর আবশ্যক নয়। (ধনী স্ত্রীর ক্ষেত্রে) স্বামী যে দাসী নিয়োগ করে তার উপরও এগুলো আবশ্যক নয়। (বরং সে স্ত্রীর সাজ সজ্জা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবে)। ঐ সব কাজ স্বামীর দায়িত্ব। চাইলে সে নিজে করতে পারে চাইলে অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারে।

ইবনে কুদামা আল-হাম্বালী ﷺ বলেন,

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا، مِنْ الْعَجْنِ، وَالْخَبْزِ، وَالطَّبْخِ وَأَشْبَاهِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ

স্ত্রীর উপর খামীর ছানা, রুটি সেকা, রান্না করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে স্বামীর খেদমত করা আবশ্যক নয়। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

[আল-মুগনী]

পরে তিনি বলেন,

أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهَا الِاسْتِمْتَاعُ، فَلَا يَلْزَمُهَا غَيْرُهُ، كَسَقْيِ دَوَابِّهِ، وَحَصَادِ زَرْعِهِ

যেহেতু বিবাহের চুক্তিই হলো উপভোগের বিষয়ে। অতএব তার বাইরে কোনো কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। যেভাবে তার পৃহপালিত জন্তুদের খাবার-পানি দেওয়া বা মাঠে ধান কাটতে যাওয়া তার উপর আবশ্যক নয়। [আল-মুগনী]

ফাতিমা ﵂ ও অন্যান্য নেককার মহিলারা বাড়ির কাজে যে পরিশ্রম করতেন সে সম্পর্কে তিনি বলেন,

فَعَلَى مَا تَلِيقُ بِهِ الْأَخْلَاقُ الْمَرْضِيَّةُ، وَمَجْرَى الْعَادَةِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ

সেগুলো ছিলো উত্তম চরিত্রের প্রকাশ এবং সামাজিক রীতি অনুযায়ী, ফরজ হিসেবে নয়।

অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় সেগুলো করেছেন। করতে না চাইলে স্বামী তাদের বাধ্য করতে পারতো না।

শেষে তিনি বলেন,

وَلَكِنْ الْأَوْلَى لَهَا فِعْلُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِقِيَامِهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ، وَلَا تَصْلُحُ الْحَالُ إِلَّا بِهِ، وَلَا تَنْتَظِمُ الْمَعِيشَةُ بِدُونِهِ

স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রীর যতটুকু কাজ করার প্রচলন আছে ততটুকু তার করা উচিৎ। যেহেতু সেটা না করলে সংসার চলতে পারে না। [আল-মুগনী]

অর্থাৎ ফরজ নয় বলে যে, সে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে তা নয়। বরং সংসারে স্বামীকে সহযোগিতা করার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে।

দেখা যাচ্ছে, শাফেয়ী ও হাম্বালী মাজহাবের আলেমরা স্ত্রীর উপর স্বামীর বাড়ির কোনো কাজই আবশ্যক করেননি। কেবল সহবাস এবং তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় ছাড়া। যেহেতু কুরআন-হাদীসে কেবল এই সব বিষয়ই উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিবাহ করাও হয় মূলত এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু হানাফী ও মালেকী মাজহাবের আলেমরা এখানে একটি সুক্ষ্ম বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তা হলো, বিবাহ যদিও করা হয় বিশেষ

একটি উদ্দেশ্যে কিন্তু তার সাথে স্বামীর বাড়িতে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কাজ করার অলিখিত অঙ্গিকারও বিবাহের চুক্তির সাথে যুক্ত থাকে। একারণে তারা বলেছেন, প্রচলিত নিয়মে যতটুকু কাজ স্ত্রীর উপর বর্তায় ন্যায়সঙ্গতভাবে তার উপর তা আবশ্যক হবে।

আলমুহীতে এসেছে,

: إن كانت من بنات الأشراف لا تجبر عليه، وعلى الزوج أن يأتيها بمن يطبخ ويخبز. وإن كانت ممن يقدر على ذلك، وهي من جملة (من) يخدم نفسها تجبر عليهما

যদি অভিজাত পরিবারের কন্যা হয় তবে তাকে (রান্না-বাড়া) করতে বাধ্য করা হবে না। বরং স্বামী রান্না-বাড়া করার জন্য লোক রাখবে। আর যদি সে এমন পরিবারের মেয়ে হয় যেখানে (সন্তানের পিছনে চাকর বাকর রাখা হয় না বরং) নিজের কাজ নিজে করা হয় তবে তাকে এসব কাজ করতে বাধ্য করা হবে।

মালেকী মাজহাবের আলেমরা বলেছেন,

{عَلَيْهِ إِخْدَامُهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تُخْدَمُ لِحَالِهَا وَغِنَى زَوْجِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ شَرَفٍ وَلَا فِي صَدَاقِهَا ثَمَنُ خَادِمٍ فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ: الْعَجْنُ وَالْكَنْسُ وَالطَّبْخُ وَالْفَرْشُ وَاسْتِسْقَاءُ الْمَاءِ.

যদি স্বামী ধনী হয় আর স্ত্রী এমন হয়, যে নিজের কাজ নিজে করে না তবে স্বামীর উপর স্ত্রীকে খেদমত কার জন্য দাসী রাখা আবশ্যক হবে। আর যদি স্ত্রী ধনী পরিবারের সন্তান না হয় এবং তার দেন মোহর একজন দাসীর মুল্যের চেয়ে কম হয় তবে (তার জন্য দাসী রাখা আবশ্যক হবে না বরং) সে নিজেই রান্না-বাড়া, ঝাড়ু দেওয়া, বিছানা পাড়া, পানি নিয়ে আসা ইত্যাদি বাড়ির ভেতরের কাজ-কর্ম করবে। [তাজ ওয়া ইকলিল]

দেখা যাচ্ছে, মালেকী মাজহাবের আলেমরা স্বামী ও স্ত্রীর অবস্থার অনুপাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর ধন সম্পদ ও সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করবে। স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে কতটুকু কাজ করবে বিষয়টার ব্যাখ্যা করে তারা বলেছেন,

خِدْمَةُ ذَاتِ الْقَدْرِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِي مَصَالِحِ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً فَعَلَيْهَا الْكَنْسُ وَالْفَرْشُ وَطَبْخُ الْقِدْرِ وَاسْتِقَاءِ الْمَاءِ

অভিজাত পরিবারের কন্যা স্বামীর বাড়িতে খেদমত করবে দাস-দাসীদের উপর হুকুম দিয়ে (নিজে পরিশ্রম করে নয়)। আর যদি স্ত্রী নিম্ন শ্রেণীর হয় তবে সে ঝাড়ু দেবে,

বিছানা পেতে দেবে, রান্না-বাড়া করবে, (নিকটবর্তী উৎস থেকে) পানি বয়ে আনবে।

[তাজ ওয়া ইকলীল]

এভাবে ধনী গরীবে বিভেদ করার কারণ হলো, শরীয়ত স্ত্রীর উপর স্বামীর বাড়ির কাজ আবশ্যক করেনি। অতএব কুরআন হাদীসের আলোকে এটা আবশ্যক প্রমাণ করা যায় না। এখন বিবাহের চুক্তিতে যে শর্ত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে কতটুকু কাজ করা স্ত্রীর উপর আবশ্যক হয় তা লক্ষ্য করতে হবে। অনেকে মনে করেছেন, বিবাহের চুক্তি হয় কেবল উপভোগের উপর। তাই তারা এর বাইরে কোনো কাজই স্ত্রীর উপর আবশ্যক করেননি। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিবাহের সময় লিখিত চুক্তির পাশাপাশি একটি অলিখিত চুক্তিও করা হয় যা স্বামী-স্ত্রী এবং তার পরিবার পরিজন সকলেই জানে। এ ধরণের অলিখিত চুক্তিকে বলা হয় উরফ বা প্রচলিত বিষয়। এই প্রচলিত চুক্তি ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন রকম হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ধনী হলে ধরেই নেওয়া হয় স্বামীর বাড়িতে দাস-দাসী ও চাকর-বাকর থাকবে। অতএব স্ত্রীকে নিজের কাজ নিজে করতে হবে না আর স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন গরীব হলে ধরেই নেওয়া হয় স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে কম-বেশি কাজ করতে হবে। এটাকেই বলা যায় অলিখিত চুক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে এই চুক্তিরও গরুত্ব রয়েছে। অতএব স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে ধরণের কাজ-কর্ম স্ত্রীর উপর বর্তায় তা তাকে আদায় করতে হবে। হানাফী ও মালেকী মাজহাবের মত এটাই। আর এটাই সঠিক মত।

একটি হাদীস থেকে এটা অনুধাবন করা যায়। জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত, একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হে জাবির তুমি কি বিবাহ করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী নাকি ছায়্যিব (বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা)? তিনি বললেন, ছায়্যিব। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটা কুমারী বিবাহ করতে পারতে। যে তোমার সাথে হাসি তামাশা করবে? তিনি বললেন,

تُوُفِّيَ وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ، فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ

আমার পিতা মারা গেছেন। আর আমার কিছু ছোট ছোট বোন আছে। তাই আমি তাদেরই মতো একজনকে বিবাহ করতে চাইনি যে তাদের দেখাশোনা করবে না, তাদের আদাব শিক্ষা দেবে না এবং তাদের (চুল আচড়ে দেওয়া ও অন্যান্য) দায়িত্ব

পালন করবে না। তাই পূর্বে বিবাহিত মহিলাকে বিবাহ করেছি যাতে সে তাদের দেখাশোনা করে এবং আদাব শিক্ষা দেয়। [বুখারী]

দেখা যাচ্ছে, কুমারী মেয়ে বিবাহ করলে ছোট বোনদের দায়িত্ব পালন করতো না বা করতে পারতো না এটাই স্বাভাবিক। একারণে তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে রাজি হয় বা করতে সক্ষম হয় এমন মেয়েকে বিবাহ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, স্বামীর বাড়িতে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা বিভিন্নরকম হতে পারে। এখন স্ত্রীকে দিয়ে যে ব্যক্তি যেমন দায়িত্ব পালন করাতে চায় তার উচিৎ তেমন মেয়ে বিবাহ করা। একদিকে কিছু পেতে হলে অন্যদিকে কিছু ছাড় দিতে হবে। কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করানোর ইচ্ছা করলে বিবাহিতা বা তালাকপ্রাপ্তা মেয়ে বিবাহ করতে হবে যাতে অভিজ্ঞতার কারণে এবং কৃতজ্ঞতাবশত সে অতিরিক্ত কিছু কাজ করে। নিজের দিকে খেয়াল রেখে কম বয়স্ক কুমারী মেয়ে বিবাহ করে তার ঘাড়ে পুরা সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যে যা করবে না বা করতে পারবে না তাকে দিয়ে তাই করানোর চেষ্টা না করে উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত পাত্রী বাছাই করতে হবে।

ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন,

وَتَجِبُ خِدْمَةُ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ وَيَتَنَوَّعُ ذَلِكَ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ فَخِدْمَةُ الْبَدْوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الْقَرَوِيَّةِ وَخِدْمَةُ الْقَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الضَّعِيفَةِ

স্বামী-স্ত্রীর অবস্থান অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর উপর আবশ্যক। অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটা বিভিন্নরকম হয়। যেহেতু গ্রাম্য মেয়েদের খেদমত শহুরে মেয়েদের মতো নয়। শক্তিশালী স্ত্রীর খেদমত দূর্বল স্ত্রীর মতো নয়। [ফাতাওয়া কুবরা]

এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অবস্থান অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গভাবে যতটুকু দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বর্তায় তা তাকে মেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক রীতি মেনে চলতে হবে যদি না তা সুস্পষ্ট জুলুম হয়। উদাহরণস্বরুপ, যদি কোনো সমাজের রীতি হয় স্ত্রী কামাই করে স্বামীকে খাওয়াবে তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেহেতু এটা সুস্পষ্ট জুলুম। একইভাবে সামাজিক রীতি নীতিতে স্বাভাবিক কাজকর্মের বাইরে অতিরিক্ত কাজ-কর্ম স্ত্রীর উপর আবশ্যক করা হলে তা সুস্পষ্ট জুলুম হওয়ার কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে।

তাজ ওয়াল ইকলীলে এসছে,

أَمَّا الْغَزْلُ وَالنَّسْجُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ

সুতো কাটা বা তাতে কাপড় বোনার কাজ কোনো অবস্থাতেই মেয়েদের নয়। তবে তারা স্বেচ্ছায় করলে করতে পারে।

মালেকী মাযহাবের ফিকাহ গ্রন্থ শারহে কাবীরে এসেছে,

وَالْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا هُوَ مِنْ التَّكَسُّبِ عَادَةً فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ لَهَا لَا عَلَيْهَا لَهُ

সেলাই ও অন্য যেসব কাজ সাধারণত আয়-উপার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো স্বামীর দায়িত্ব, স্ত্রীর নয়।

ইবনে কুদামা ﷬ বলেন, (كَسَقْيِ دَوَابِّهِ، وَحَصَادِ زَرْعِهِ) "যেভাবে তার গৃহপালিত জন্তুদের খাবার-পানি দেওয়া বা মাঠে ধান কাটতে যাওয়া তার উপর আবশ্যক নয়।"

[আল-মুগনী]

এই আলোকে বলা যায়, যারা বাড়িতে মুরগী বা গরুর খামার করে তার যাবতীয় দায়িত্ব স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন এবং কোনো ত্রুটি করলে লাঠি পেটা করেন তারা নিঃসন্দেহে স্ত্রীর উপর জুলুম করছেন। একইভাবে দেখা যায় হোটেল ওয়ালা হোটেলের রান্না-বান্না ও মিষ্টি-সামগ্রী বাড়িতে বসে স্ত্রীকে দিয়ে তৈরী করে নেয়। কৃষক তার ফসল মাড়ানো ও সিদ্ধ শুকনো করার কাজে নিজ স্ত্রীকে ব্যবহার করে। এসবের কিছুই কিন্তু স্ত্রীর উপর দায়িত্ব নয়। স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় এসব কাজ করলে সেটা উত্তম স্বভাব বলেই গণ্য হবে। স্ত্রীরও উচিৎ সাধ্যমতো এসব কাজ করা। যেহেতু নবীর মেয়ে ফাতেমা ﵂ ও আবু বকর ﵁ এর মেয়ে আসমা ﵂ সংসারের কঠিন কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে এসব হাদীস উল্লেখ করা হবে। সত্যি বলতে এসব দায়িত্ব পুরোপুরি এড়িয়ে গেলে সংসার চলতেই পারে না। কিন্তু স্বামীকে মনে রাখতে হবে এসব কাজ স্ত্রীদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তাই তাদের এসব কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। এসব কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি করলে মারধরও করা যাবে না। বরং উত্তম আচরণ ও মিষ্টি কথার মাধ্যমে যতটুকু আদায় করা যায় তাই যথেষ্ট মনে করতে হবে। সেক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো অতিরিক্ত বোঝা তার ঘাড়ে চেপে না যায়। তেমন হলে তাকে সহযোগিতা করতে হবে বা সহযোগিতা করার জন্য লোক নিয়োগ করতে হবে।

শারহে কাবীরে বলা হয়েছে, (وَطَبْخِ لَهُ لَا لِضُيُوفِهِ) "স্ত্রী স্বামীর জন্য রান্না-বাড়া করতে বাধ্য, তার মেহমানদর জন্য নয়"।

এই কথার মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সাধারণভাবে মাঝে মাঝে দুই একজন মেহমান আসলে তাদের জন্য রান্না-বাড়ার ব্যাপারটি সাধারণ নিয়মের মধ্যেই পড়ে। স্ত্রী তাই তা এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু ভাই-বোন, বা তাদের ছেলে মেয়েদের এক রকম স্থায়ীভাবে বাড়িতে রেখে দিয়ে তাদের রান্না-বাড়ার ভার স্ত্রীর উপর অর্পণ করা অবশ্যই সুবিবেচনা নয়। স্ত্রী এটা করতে বাধ্যও নয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আশা করি স্বামীর বাড়িতে স্ত্রী কতটুকু কাজ করতে বাধ্য সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া গেছে। স্ত্রী যে দাস-দাসীর মতো নয় সেটাও আশা করি বোঝা গেছে। এটা জানার পর আশা করি, স্বামীরা স্ত্রীদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন এবং সেই সকল কাজ স্ত্রীদেরই করা উচিৎ এমন মনে করে অহমিকা প্রদর্শন করা হতেও বিরত হবেন। দয়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে মারধর করে তাদের বাধ্য করার চেষ্টাও যেনো তারা না করেন। যেহেতু সেটাই হবে প্রকৃত জুলুম।

তবে স্ত্রীদের উচিৎ কেবল যতটুকু দায়িত্ব তা আদায় করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো এমন নীতি গ্রহণ না করা। যেহেতু সংসারে চলতে হলে কেবল দায়িত্বটুকু সমানে সমানে আদায় করে গেলে হয় না। অতিরিক্ত কিছুও আদায় করতে হয়। স্বামীও তো স্ত্রীর জন্য অনেক অতিরিক্ত ব্যয় করে থাকে। তিন বেলা পেট পুরে খাবার আর সতর ঢাকার মতো পোশাক দিয়েই কি স্বামী থেমে যায়? আরো কত রকম শখের জিনিস স্বামীরা স্ত্রীদের প্রদান করে যা তার উপর আবশ্যক ছিলো না। বিনিময়ে স্ত্রীরও উচিৎ সাধ্যমতো পরিশ্রম করে স্বামীকে সহযোগিতা করা। রসুলের যুগের নেককার মহিলারা কঠোর পরিশ্রম করতেন।

একটি হাদীসে এসেছে,

أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ

আটা পিশতে পিশতে ফাতেমা ﵂ এর হাতে দাগ হয়ে গিয়েছিলো। [বুখারী]

আসমা ﵂ বলেন,

كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ

আমি আমার স্বামী যুবাইরের বাড়ির সকল কাজ করতাম। তার একটা ঘোড়া ছিলো। আমি সেটার দেখাশোনা করতাম। ঘোড়াটা দেখা-শোনা করার মতো কঠিন দায়িত্ব আমার উপর আর কিছু ছিলো না। [মুসলিম]

এরপর তিনি সেই কঠিন দায়িত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বেশ দূর থেকে তিনি খেজুরের আটি বয়ে আনতেন পরে সেটা পেশায় করে ঘোড়াকে খাওয়াতেন, পানি বয়ে আনতেন ইত্যাদি।

ইমাম নাব্বী ﵀ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এসব কাজ মেয়েদের উপর ফরজ নয়। তবে তা উত্তম স্বভাব হিসেবে গণ্য যার উপর প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মহিলারা টিকে আছে। তিনি বলেন,

ولايجب عليها شيء من ذلك بل لوامتنعت مِنْ جَمِيعِ هَذَا لَمْ تَأْثَمْ وَيَلْزَمُهُ هُوَ تَحْصِيلُ هَذِهِ الْأُمُورِ لَهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلْزَامُهَا بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وَإِنَّمَا تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةُ تَبَرُّعًا

তবে এর কোনো কিছু স্ত্রীর উপর ফরজ নয়। যদি সে করতে না চায় তবে পাপী হবে না। তখন স্বামীর দায়িত্ব হবে সেগুলো সমাধা করা। স্ত্রীকে এসব কাজ করতে বাধ্য করা স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। মেয়েরা এগুলো স্বেচ্ছায় করলে করবে।

[শারহে মুসলিম]

উপরে আমরা বলেছি, শাফেয়ী মাজহাব মতে মেয়েদের উপর স্বামীর বাড়ির কোনো কাজই আবশ্যক নয়। ইমাম নাব্বী ﵀ এখানে সেই মত অনুযায়ীই কথা বলেছেন। তবে অন্যান্য আলেমদের মতে মেয়েদের উপর স্বামীর বাড়ির স্বাভাবিক ও সাধারণ কাজকর্মগুলো আবশ্যক। সে হিসেবেও বলা যায়, আসমা ﵂ এখানে যত দায়িত্ব পালন করেছেন তার সবই তার উপর আবশ্যক ছিলো না। বিশেষত বহু দূর থেকে খেজুরের আটি কুড়িয়ে এনে তা পেশায় করে ঘোড়ার খাওয়ার বিষয়টি অবশ্যই তার উপর আবশ্যক ছিলো না। যেহেতু ঘরের বাইরের কাজ মেয়েদের উপর নয় এ ব্যাপারে সকলে একমত। দেখা যাচ্ছে, এসব কাজের কিছু অংশ তিনি স্বেচ্ছায় করেছেন। তিনি সেটা না করলে পাপী হতেন না। তার স্বামী তাকে বাধ্যও করতে পারতো না। তার এই কাহিনী থেকে তাই এযুগের স্বামী-স্ত্রী উভয়কে শিক্ষা নিতে হবে। স্ত্রী যেমন তার

দায়িত্বের বাইরের কাজ স্বেচ্ছায় যতটুকু সম্ভব আদায় করার চেষ্টা করবে স্বামীও তেমনই দায়িত্বের বাইরের কোনো কাজ স্ত্রীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেবে না। একারণে স্ত্রীকে বকা-ঝকা বা মারধরও করবে না। এই হলো প্রকৃত ইনসাফ আর এর অন্যথা করা সুস্পষ্ট জুলুম।

অনেক স্বামী স্ত্রীর উপর অতিরিক্ত খেদমত চাপিয়ে দেয়। গোসলের সময় গামছা নিয়ে দাড়িয়ে থাকা, পানি তুলে দেওয়া, খাবার সময় হাওয়া দেওয়া। প্রয়োজনের চেয়ে অধিক কাপড়-চোপড় সর্বক্ষণ কেচে ও ইস্ত্রি করে ফিটফাট রাখা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে সামান্য ত্রুটি হলে স্ত্রীকে বকা-ঝকা বা এমনকি প্রহার পর্যন্ত করেন। বলা বাহুল্য যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা থাকলে স্ত্রী এগুলো এমনিতেই পালন করবে এবং পালন করা উচিতও। ভালবেসে এগুলো করতে স্ত্রীর কষ্টও হয় না বরং ভাল লাগে। কিন্তু এসব বিষয়ে বাধ্য করা হলে স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণার জন্ম নিতে পারে। যার ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাছাড়া এতসব বিষয় স্ত্রীর উপর ফরজও নয়। তাই তাকে বাধ্য করা বিশেষত এসব কারণে প্রহার করা সঠিক নয়।

শশুড়–শাশুড়ির খেদমত

এখন প্রশ্ন হলো, স্ত্রী তার স্বামীর পিতা-মাতাকে রান্না-বাড়া করে খাওয়াতে বাধ্য কিনা। উপরে আমরা যেসব দলীল-প্রমাণ এবং ওলামায়ে কিরামের মন্তব্য উল্লেখ করেছি তার কোথাও স্ত্রীর উপর স্বামীর পিতা-মাতার খেদমতের কথা বলা হয়নি। আমরা দেখেছি, আলেমদের একটি অংশ বলেছেন, স্ত্রীর উপর ফরজ কেবল দুটি বিষয়। স্বামীর বাড়িতে কেবল স্বামীর নিকট নিজেকে পেশ করা এবং তার অনুমতি ছাড়া তার বাড়ি থেকে বের না হওয়া। এর বাইরে কোনো কিছুই তার উপর ফরজ নয়। স্বামী বা শশুর-শাশুড়ির জন্য তো নয়ই এমনকি নিজের খাবারও সে নিজে রান্না করতে বাধ্য নয়। বরং স্বামী রান্না-বাড়া করার জন্য লোক রাখবে। এটাই শাফেয়ী ও হাম্বালী মাজহাবের মত। হানাফী ও মালেকী মাজহাবের আলেমরা ধনী ও অভিজাত ফ্যামিলীর স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন ফতোয়াই দিয়েছেন। কিন্তু আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে তারা বলেছেন, স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে সমাজের রীতি অনুযায়ী স্বাভাবিক কাজকর্ম নিজে হাতেই সম্পাদন করবে। এর মধ্যে তারা উল্লেখ করেছেন, নিজের জন্য এবং স্বামীর জন্য রান্না-বাড়া করা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, পানি বয়ে আনা

ইত্যাদি। তারাও কিন্তু স্বামীর পিতা-মাতার জন্য রান্না-বাড়া করা বা তাদের বাড়ি-ঘড় পরিষ্কার করা, তাদের কাপড় কাচা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেননি। উল্টো বলেছেন, স্বামীর মেহমানদের জন্য রান্না-বাড়া করতে স্ত্রী বাধ্য নয়। তাছাড়া স্ত্রী স্বামীর পিতা-মাতার সাথে একত্রে অবস্থান করতে না চাইলে তাকে পৃথক রাখতে স্বামী বাধ্য এমন ফতোয়াও রয়েছে। পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, স্বামীর পিতা-মাতার ব্যাপারে কোনো দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বর্তায় না। তাই স্বামী তাকে মার-ধর করে বাধ্য করতে পারে না। তবে স্বামীর উপর তার বাবা-মায়ের ভরন-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে। তারা অভাবী হলে তাদের বাজার-ঘাট করে দেওয়া এবং তারা রান্না-বান্নায় অক্ষম হলে রান্না করার জন্য লোক নিয়োগ করা ছেলের উপর দায়িত্ব। এখানে এমন মনে করা সুস্পষ্ট জুলুম যে, এই দায়িত্ব স্ত্রীকেই পালন করতে হবে। অজ্ঞ লোকেরা বলে, আমি তাকে খাওয়াই পরাই আর এতটুকু করবে না? তারা ভুলে যায় যে, স্ত্রী খাওয়া-পরার খরচ পাচ্ছে বিবাহের চুক্তির কারণে। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো, স্বামীকে বিনোদন দেওয়া। স্ত্রীর উপর মূলত এটাই ফরজ। এতটুকুই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলেমরা এ ব্যাপারে একমতও হয়েছেন। এর সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে যতটুকু কাজ না করলে সংসার চলতে পারে না কিছু কিছু আলেম স্ত্রীর উপর তাও আবশ্যক করেছেন। আমরা বলেছি এটাই সঠিক মত। তার বাইরে স্বামী যদি তার নিজের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দিতে চায় তবে তা অন্যায় হবে। উদাহরণস্বরুপ, যদি কারো নিজের একটা দোকান থাকে আর তার বাবার একটা দোকান থাকে। এখন সে যদি নিজের দোকানে কোনো কর্মচারী রাখে তবে এই কর্মচারী তার বাবার দোকানের কাজ করতে বাধ্য নয়। এখন যদি সে উভয় দোকানের কাজ করতে কর্মচারীকে বাধ্য করে তবে তা হবে সুস্পষ্ট জুলুম। এমন বললে হবে না যে, আমি তোকে এত টাকা বেতন দিই আর এইটুকু কাজ করবি না? একথা বলা বোকামী। কারণ, বেতনের পরিমান যায় হোক সেটা দেওয়া হয়েছে ভিন্ন জায়গায় কাজ করার চুক্তিতে। স্বামীর সাথে স্ত্রীর চুক্তিও তার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে নয় বরং নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে।

তাছাড়া চিন্তা করলে দেখা যাবে, স্ত্রী স্বামীর যতটুকু খেদমত করে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে যতটুকু কাজ-কর্ম করে অন্য কাউকে পারিশ্রমিক দিয়ে তা করাতে গেলে স্ত্রীর উপর যতটুকু খরচা হয় তার চেয়ে ঢের বেশি খরচ-খরচা হবে। রান্না-বাড়া ও কাপড় কাচার

জন্য একটা কাজের মেয়ে রাখলেও তো তিন বেলা খাবার আর পোশাক আশাক দেওয়া লাগে, সাথে কিছু পারিশ্রমিকও দিতে হয়। উপভোগের বিষয়টা তো বাদই থাকলো। অন্যভাবে তা মেটাতে গেলে কতটা খরচ হবে আর মান সম্মান কতটা নষ্ট হবে সেটা না হয় নাই বললাম। এটা মনে রাখলে "আমি তাকে খাওয়াই পরাই" একথা বলে স্বামী গর্ব প্রকাশ করতে পারে কি? আসলে স্বামী যেমন স্ত্রীকে খাওয়ায় পরায় নেককার স্ত্রীও তাকে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়েই দেয়। এখানে স্বামী-স্ত্রী সমান সমান। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর উপর যে সম্মানটা পায় সেটা আল্লাহর দয়া। মহান আল্লাহ এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

স্ত্রীদের উপর যতটুকু দায়িত্ব আছে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের ততটুকু অধিকারও আছে। তবে পুরুষদের তাদের উপর অধিক সম্মান প্রদান করা হয়েছে। [বাক্বারা/২২৭]

অর্থাৎ স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি যতটুকু দায়িত্ব পালন করে স্ত্রীরাও স্বামীদের প্রতি অনুরুপ দায়িত্ব পালন করে। অতএব, এ দিক থেকে কেউ গর্ব করতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহ স্বামীকে অতিরিক্ত সম্মান দিয়েছেন তাই স্ত্রীকে তা মেনে নিতে হবে।

অন্য আয়াতে এসেছে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

পুরুষরা নারীদের উপর দায়িত্বশীল। যেহেতু আল্লাহ দয়া করে তাদের এ সম্মান দিয়েছেন আর যেহেতু তারা (স্ত্রীদের পিছনে) সম্পদ ব্যয় করে। [নিসা/৩৪]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এখানে কেবল সম্পদ ব্যয় করার কারণে স্বামী সম্মানিত এমন বলা হয়নি। সেই সাথে আল্লাহর দয়া করে সম্মান দিয়েছেন এটাও বলা হয়েছে। যেহেতু কেবল সম্পদ ব্যয় করার কথা বললে যুক্তির মানদন্ডে তা খন্ডায়ন করা যায়। যেহেতু স্ত্রীরা বলতে পারে তোমরা সম্পদ ব্যয় করো আর আমরা তোমাদের জন্য পরিশ্রম করি। অতএব দুজনে সমান সমান। কিন্তু ইসলামের বিধানে এর পরও স্বামী স্ত্রীর উপরে থেকে যায়। এর একমাত্র কারণ আল্লাহ দয়া করে তাদের এ সম্মান দিয়েছেন। এ কথা মনে না রেখে যেসব স্বামীরা বারংবার খাওয়া-পরা আর খরচ-খরচার কথা বলে স্ত্রীরা একথার মোক্ষম জবাবও দিতে পারে। বলতে পারে, আমার পিছনে তুমি যা খরচ করো

তাতে তো একটা কাজের মেয়ের বেতনও হয় না। অতএব, খাওয়া পরার কথা বলে খুব একটা লাভ নেই। স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্মান আল্লাহর পক্ষ থকে নির্ধারিত। সেদিকে খেয়াল রাখাই যথেষ্ট।

অতএব "খাওয়াই পরাই এই যুক্তিতে" স্ত্রীকে দাসী মনে করা বা স্ত্রীকে দিয়ে যতটা খুশি কাজ করিয়ে নেওয়া ইনসাফের পরিচয় নয়। কুরআন-হাদীসের কোথাও একথা বলা হয়নি। কোনো আলেম এমন ফতোয়া দেননি। বরং স্ত্রী একটি স্বাধীন মানুষ। তার সাথে বিশেষ একটা বিষয়ে স্বামীর চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তির বাইরে কোনো কিছু সে করতে বাধ্য নয়। এখন দেখতে হবে চুক্তির মধ্যে কি কি দায়িত্ব পড়ে। কেবল সেগুলো স্ত্রীকে বাধ্য করে আদায় করা যাবে। আর তার বাইরে কোনো কাজ তাকে দিয়ে করাতে হলে বাধ্য করে নয় বরং উত্তম আচরণ ও সদুপদেশের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। পিতা-মাতার খেদমতের বিষয়টিও অনুরুপ। স্ত্রী এটা করতে বাধ্য নয়। না করলে তার পাপও হবে না, তাকে বাধ্যও করা যাবে না। তবে স্ত্রীর উচিৎ অধিক কষ্টকর না হলে যথাসম্ভব তাদের খেদমত করা। যেহেতু সে এটা করতে অস্বীকার করলে তার স্বামীর উপর পৃথকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা কষ্টকর হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রী, শশুর-শাশুড়ি সবার মধ্যে এই জ্ঞান থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এই জ্ঞান না থাকার কারণে দেখা যায়, শশুর শাশুড়ি পুত্রবধুর নিকট থেকে দাস-দাসীর চেয়েও বেশি খেদমতের আশা করে। ভাত বেড়ে বসে থাকা, খাওয়ার সময় হাওয়া দেওয়া, শোওয়ার সময় বিছানা পেতে দেওয়া, সকালে বিছানা তুলে দেওয়া, কাপড়-চোপড় কেচে দেওয়া ইত্যাদি সকল কাজ তারা স্ত্রীকে দিয়ে করাতে চায়। এসবে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তুলকালাম কান্ড বেধে যায়। বেশিরভাগ পুত্রবধুই তাই গাধার মতো পরিশ্রম করেই শাশুড়ির কাছে নাম পায় না। শাশুড়ি এমন করে কারণ সে মনে করে ছোট বড় সব বিষয়ে পুত্রবধু তার খেদমত করতে বাধ্য। অনেক স্বামীও এমন মনে করে। তাই মায়ের সাথে তাল মিলিয়ে স্ত্রীর উপর চড়াও হয়। এভাবে সংসারে সদা-সর্বদা অশান্তি লেগেই থাকে। যদি স্বামী ও শাশুড়ি প্রকৃত ঘটনা জানতো তবে স্ত্রী যতটুকু করে তাতেই সন্তুষ্ট হতো এবং সংসারে শান্তি বিরাজ করতো।

অনেকে বলতে পারেন, আলেম-ওলামারা প্রচলিত রীতি নীতি অনুযায়ী যতটুকু দায়িত্ব বর্তায় স্ত্রীর উপর ততটুকু পালন করা আবশ্যক বলেছেন। প্রচলিত নিয়মে শশুর-

শাশুড়ির খেদমত করার বিষয়টিও স্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। একথা বাহ্যিকভাবে সঠিক মনে হলেও চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রচলিত রীতি নীতিতে স্বামীর বাড়িতে স্বামী-সন্তানদের জন্য রান্না-বাড়া করা, ঘর-দোর ছাড়া-মোছা করা ইত্যাদি কাজ নিশ্চিতভাবে স্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে পড়লেও শশুর শাশুড়ির খেদমতের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে পড়ে না। যেহেতু বহু নব দম্পত্তি বিবাহের পরপরই আলাদা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে স্ত্রী বা তার পরিবার ভাবতেই পারে যে, বিবাহের কিছুদিন পরই পিতা-মাতা সন্তানকে আলাদা করে দেবে। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকে। সেক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব কে পালন করবে তা নিয়ে একটা সম্ভাবনা সব সময়ই থেকে যায়। সেক্ষেতে স্ত্রী বলতেই পারে আমি একা কেনো পালন করবো? এরপরও যদি ধরে নেওয়া হয় প্রচলিত নিয়মে শশুড়-শাশুড়ির খেদমত করা পুত্রবধুর উপর আবশ্যক তবে প্রশ্ন থেকে যায় সেটা কতদূর? কেবল রান্না-বাড়া করে খাওয়ানো নাকি তাদের কাপড় কাচা, হাওয়া দেওয়া, বিছানা পেতে দেওয়া, রোগ হলে সেবা শশ্রুষা করা ইত্যাদি সব? চিন্তা করলে দেখা যাবে, বিবাহের চুক্তির মধ্যে এতসব দায়িত্বের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারনা থাকে না। আর তাই সেগুলোকে অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় এসব কাজ করলে সেটা নিঃসন্দেহে মানবতা হিসেবে গণ্য হবে। বিপরীতে একটা মেয়েকে পুত্রবধু হিসেবে গ্রহণ করার সময় শাশুড়িরা মেয়ের মতো রাখবো, আমার বাড়িতে তেমন কোনো কাজ নেই, রাণী হয়ে থাকবে ইত্যাদি যতসব ওয়াদা করেন সেগুলো মনে রাখলে এসব বিষয় আরো অস্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব পরবর্তীতে শাশুড়ির পক্ষ থেকে মা সুলভ আচরণ না পেলে স্ত্রী যদি বেকে বসে তবে তাকে নিন্দা করা যায় কি? এতসব অস্পষ্টতার কারণেই বিবাহের চুক্তির মধ্যে শশুড়-শাশুড়ি ও দেবর-ননদদের কোনো দায়িত্ব স্ত্রীর উপর আবশ্যক না হওয়ার বিষয়টিই সঠিক।

তছাড়া সমাজিক প্রচলনে স্ত্রীর উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপানোর রীতি থাকলে তা বাতিল বলে গন্য হবে। উদাহরণসরুপ, যদি কোনো সমাজের রীতি হয় স্ত্রী কামায় করে স্বামীকে খাওয়াবে তবে সেই রীতি অনুযায়ী স্ত্রীকে উপার্জন করতে বাধ্য করা বৈধ হবে না। নিজের খেদমত বা স্বামীর খেদমতের বাইরে অতিরিক্ত পরিশ্রমের রীতিও মেনে চলতে স্ত্রী বাধ্য নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন। শারহে কাবীরের হাশীয়াতে আদ দুসুকী “স্ত্রী মেহমানদের জন্য রান্না করতে বাধ্য নয়” এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেন,

أَيْ وَلَا لِأَوْلَادِهِ، وَلَا لِعَبِيدِهِ وَلَا لِأَبَوَيْهِ

অর্থাৎ স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান, তার দাস-দাসী (বর্তমান সময়ে কর্মচারী ও জন-মুনীশ), পিতা-মাতা ইত্যাদির খাবার রান্না করতে স্ত্রী বাধ্য নয়।

পরে তিনি উল্লেখ করেন,

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَلَا يَلْزَمُهَا، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ

এসব (স্ত্রী করলে তা) সদাচারন হিসেবে গন্য। কিন্তু সে তা করতে বাধ্য নয়। এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, যদিও এসব কাজ করা সমাজের রীতি হয় (তবুও বাধ্য নয়)।

অন্য স্থানে তিনি সুতো কাটা বা তাতে কাপড় বোনা স্ত্রীর উপর আবশ্যক নয় এটা বর্ণনা করার পর বলেন,

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ نِسَاءِ بَلَدِهَا جَارِيَةً بِالنَّسْجِ وَالْغَزْلِ

এর প্রকাশ্য অর্থ হলো, যদিও ঐ এলাকার সামাজিক রীতিতে স্ত্রী সুতা কাটবে বা তাত বুনবে এমন প্রচলন থাকে।

এক্ষেত্রে যদি স্বামী বিবাহের পূর্বেই স্ত্রীর নিকট থেকে কোনো ওয়াদা গ্রহণ করেন তবে স্ত্রীর উচিৎ সেটা যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করা। আর স্বামীরও খেয়াল রাখা উচিৎ যেনো তা অধিক কষ্টকর না হয়।

স্ত্রীর উপর স্বামীর আনুগত্য কতদূর?

উপরে আমরা বলেছি, ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর বিশেষ কিছু বিষয় এবং সংসারের বিশেষ কিছু দায়িত্ব ছাড়া স্ত্রীর উপর আর কিছুই আবশ্যক নয়। এমনকি শশুর-শাশুড়ির খেদমত করতেও আইনত সে বাধ্য নয়। মানবতার খাতিরে সাধ্যমত খেদমত সে করবে। কিন্তু না করলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। অনেকে এখানে একটি চালাকী করে থাকেন। বিভিন্ন হাদীসে স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং স্বামীর অবাধ্য হতে নিষেধ করা হয়েছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর হক সম্পর্কিত আলোচনায় সেসব হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। তারা বলেন, স্ত্রীর উপর শশুড়-শাশুড়ির খেদমত করা আবশ্যক নয় কিন্তু স্বামীর আনুগত্য তো আবশ্যক। এখন স্বামী যদি স্ত্রীকে শশুড়-শাশুড়ির খেদমত করার আদেশ করে তাহলে কি সে তা করতে বাধ্য নয়? এভাবে স্বামীর আনুগত্যের যুক্তিতে স্ত্রীর উপর দায়িত্বের চেয়ে বেশি বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার

চেষ্টা করা হয়। অনেকের নিকট এই চালাকি বেশ যৌক্তিক মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এটা সম্পূর্ণ অসার ও অবাস্তব যুক্তি। প্রশ্ন হলো, হাদীসে স্বামীর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা কি সব বিষয়ে নাকি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে? উপরে আমরা পিতা-মাতার আনুগত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, এমনকি পিতা-মাতার আনুগত্যও সব বিষয়ে নয়। যেসব ব্যাপারে বোকামী বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আছে বা নিজের উপর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আছে সেসস বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য করতে সন্তান বাধ্য নয়। এখন স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে আনুগত্যের ব্যাপারটি কেমন? স্বামীর নির্দেশে নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে কি স্ত্রী বাধ্য? এ বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দেওয়ার অর্থ হলো, স্ত্রীর উপর জুলুম নির্যাতনের যাবতীয় রাস্তা খুলে দেওয়া। স্বামী হয়তো স্ত্রীকে বলল, তুমি দেন মোহরের দাবী ছেড়ে দাও। স্ত্রী তা করতে বাধ্য থাকবে। স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরন পোষনের দায়িত্ব ছিলো। সে বলল, বাবার বাড়ি থেকে কান্না-কাটি করে খরচ-খরচা নিয়ে এসো। স্ত্রী তা করতে বাধ্য থাকবে। ইনকামের দায়িত্ব ছিলো স্বামীর উপর। সে পর্দার সাথে বৈধ পন্থায় কামায় করার একটা রাস্তা দেখিয়ে স্ত্রীকে আদেশ করবে, কামায় করে তাকে খাওয়ানোর জন্য। স্ত্রী তাই করতে বাধ্য থাকবে। এক কথায়, পুরা সংসারটা মগের মুল্লুকে পরিণত হবে। আগা-মাথা চিন্তা না করেই যারা কথা বলে তারাই এমন হাস্যকর ফতোয়া দিয়ে থাকে। সত্য কথা হলো, সন্তান পিতা-মাতাকে যতটুকু আনুগত্য করে স্ত্রীর উপরে স্বামীর আনুগত্য তার চেয়ে কম পরিসরে। যেহেতু পিতা-মাতার আনুগত্য কোনো চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই নিজের ক্ষয়ক্ষতি হয়না বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে না এমন সকল ক্ষেত্রে সন্তান পিতা-মাতার আনুগত্য করবে। কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য বৈবাহিক চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এই চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়েই কেবল স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে। এক কথায় বলা যায়, বিবাহের মাধ্যমে স্বামীর যতটুকু হক প্রদান করতে স্ত্রী বাধ্য সেই সকল ক্ষেত্রে সে স্বামীর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য, তার বাইরে নয়। একারণে হাদীসে স্বামী যখন বিশেষ প্রয়োজনে স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে তখন অস্বীকার করলে ফেরেস্তারা অভিসাপ দেয় বা আল্লাহ নারাজ হোন এমন বলা হয়েছে। উপরে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক সম্পর্কিত আলোচনায় এসব হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি।

হানাফী ফাকীহ ইবনে নুজাইম ﵀ বলেন,

الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ خُصُوصًا إِذَا كَانَ فِي أَمْرِهِ إِضْرَارٌ بِهَا

একজন মহিলার উপর বিবাহের চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। বিশেষত যদি তাতে তার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। [বাহরে রায়েক]

ইবনে কুদামা আল-হাম্বালী ﷬ নুসুজ (نشوز) তথা স্বামীর অবাধ্যতার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

مَعْنَى النُّشُوزِ مَعْصِيَتُهَا لِزَوْجِهَا فِيمَا لَهُ عَلَيْهَا، مِمَّا أَوْجَبَهُ لَهُ النِّكَاحُ

নুসূজ অর্থ হলো, বৈবাহিক যুক্তির মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্বামীর যতটুকু হক আবশ্যক হয় সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হওয়া। [আল-মুগনী]

মালেকী মাজহাবের ফিকাহ গ্রন্থ শারহে কাবীরে এসেছে,

النُّشُوزُ الْخُرُوجُ عَنْ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ كَأَنْ مَنَعَتْهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إِذْنٍ لِمَحِلٍّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ فِيهِ أَوْ تَرَكَتْ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى كَالْغُسْلِ أَوْ الصَّلَاةِ

নুসুজ (স্বামীর অবাধ্যতা) হলো, যে বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা ফরজ সে বিষয়ে তার অবাধ্য হওয়া। যেমন তাকে উপভোগে বাধা দেওয়া বা তার অনুমতি না নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এমন স্থানে যাওয়া যেখানে যাওয়ার ব্যাপারে সে অনুমতি দেবে না এটা স্ত্রীর জানা আছে। অথবা আল্লাহর হক যেমন, নামাজ, ফরজ গোসল ইত্যাদি পরিত্যাগ করা।

এছাড়া বিভিন্ন মাজহাবের ফিকাহ গ্রন্থে দেনমোহর আদায় না করলে স্বামীর কাছে আসতে অস্বীকার করা, স্বামী কোনো হক আদায় করতে অস্বীকার করলে তাল অনুমতি ছাড়াই কাজির কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়কে স্ত্রীর হক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলো স্ত্রীর পক্ষ থেকে অন্যায় বা পাপের কাজ নয়। স্বামীর আনুগত্যের নামে তার অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করতেও সে বাধ্য নয়।

এ হিসেবে বলা যায় বিবাহের চুক্তির মাধ্যমে স্ত্রী যেসব অধিকার পাওয়ার কথা স্বামী সেগুলো তাকে দিতে বাধ্য থাকবে। স্ত্রীকে সেসব বিষয়ে ছাড় দেওয়ার আদেশ করলেই স্ত্রী তা করতে বাধ্য থাকবে না। একইভাবে বিবাহের চুক্তির মাধ্যমে যেসব দায়িত্ব স্ত্রীর উপর পড়ে না স্বামী আদেশ করলেও সেগুলো সে পালন করতে বাধ্য থাকবে না। এমন হলে তো শেষে স্বামী স্ত্রীকে দিয়ে কামায় করিয়ে ঘরে বসে খাবে। তবে সুস্পষ্ট জুলুম-

নির্যাতন নয় এমন কোনো বিষয়ে সাধ্যমত স্বামীর আনুগত্য করে যাওয়া এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা নেককার স্ত্রীর বৈশিষ্ট। স্বামীর আনুগত্য বলতে এই বিষয়টিকেই বোঝায়। তাই বলে, এই বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে স্বামী স্ত্রীর হক বিনষ্ট করতে পারে না।

তবে স্ত্রীকে স্মরণ রাখতে হবে, যেসব বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য ফরজ সেসব বিষয়ে সামান্যও ত্রুটি করার পরিনাম অত্যন্ত ভয়াবহ। উপরে বেশ কিছু হাদীসে আমরা দেখেছি, স্বামীর ডাকে সাড়া না দিলে ঐ স্ত্রীর উপর ফেরেশতাদের লানত আর মহান আল্লাহর গজব পতিত হয়। স্বামীর হক আদায়ের ব্যাপারে স্ত্রীকে তাই সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। স্বামীকে উপভোগ করতে বাধা দেওয়া বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাড়ি থেকে বের হওয়া কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মারাত্মক অন্যায়। এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরাম অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করেছেন।

আলমাওয়ারদী ﵀ বলেন,

وَلَا تَلْقَاهُ إِلَّا مُعَبِّسَةً وَلَا تُجِيبُهُ إِلَّا مُتَبَرِّمَةً لَكِنَّهَا مُطِيعَةٌ لَهُ فِي الْفِرَاشِ، فَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ النُّشُوزِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزًا

যদি এমন হয় যে, স্ত্রী স্বামীর সাথে স্বাক্ষাত হলেই ভ্রু কুঞ্চিত করে আর তার ডাকে সাড়া দেয় ঠিকই কিন্তু মুখ গোমড়া করে থাকে তবে সহবাসে বাধা দেয় না এটা সরাসরী অবাধ্যতা না হলেও অবাধ্যতারই বহিঃপ্রকাশ। [হাবীল কাবির]

ইমামুল হারামাইন আবুল মায়ালী ﵀ বলেন,

للزوج أن يُلزم المرأةَ لزومَ البيت، ويمنعَها من الخروج حسماً، ويمنعها عن عيادة الوالدين إذا مرضا فضلاً عن زيارتهما، ويمنعها عن شهود تجهيزهما إذا ماتا، هذا الحق ثابت له إجماعاً

স্বামী তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে একেবারে বের না হওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। তাকে সে এমনকি তার পিতা-মাতা অসুস্থ হলেও তাদের দেখতে যেতে নিষেধ করতে পারে আর শখের বসে বাপের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা। পিতা-মাতা মারা গেলেও তাদের দেখতে যাওয়া থেকে সে তাকে নিষেধ করতে পারে। স্বামীর এই অধিকারটির ব্যাপারে ইজমা সম্পদাতি হয়েছে। [নিহায়াতুল মাতলাব]

তিনি এ বিষয়ে ইজমার দাবী করলেও হানাফী মাজহাবে এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, পিতা-মাতা অসুস্থ হলে এবং কন্যাকে দেখতে আসতে

অক্ষম হলে স্বামীর অনুমতি ছাড়াও সে তাদের দেখতে যেতে পারে। [বাহরে রায়েক]

তবে উপরে যা বলা হলো সেটই বেশিরভাগ আলেমের মত। এটা স্বামীর অধিকার। স্বামী এমন আদেশ করলে করতে পারে এবং স্ত্রী মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু স্বামীর উচিৎ এমন কড়াকড়ি না করা।

ইমামুল হারামাইন ﵀ উক্ত গ্রন্থে পরবর্তীতে বলেন, ইমাম শাফেয়ী ﵀ বলেন, (وما أحب ذلك) "আমি এটা পছন্দ করি না"। গ্রন্থকার বলেন,

أراد: أني لا أستحب للزوج الغلوّ إلى هذا الحد؛ فإنه سرف يُفضي إلى الحمل على قطيعة الأرحام، ثم فيه حملُها على ما تمقُت به الزوجَ

তার উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর জন্য উত্তম হবে এসব কাজে এতটা বাড়াবড়ি না করা। যেহেতু এর কারণে স্ত্রীর সাথে তার আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে। তাছাড়া এর কারণে হয়তো স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ঘৃণার জন্ম নেবে।

হাম্বালী মাজহাবের কোনো কোনো আলেমের মতে পিতা-মাতা অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া স্বামীর উপর ফরজ। অর্থাৎ সে অনুমতি না দিলে পাপী হবে তবে স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে না। [আল-ফুরু, ইবনে মুফলিহ]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, স্বামীর বাড়িতে আটকে থাকা এবং সদা সর্বদা স্বামীর খেদমতে লেগে থাকার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, স্বামীর নির্দেশ ছাড়া পিতা-মাতা অসুস্থ হলে বা মারা গেলেও তাদের দেখতে যাওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। স্বামীর নির্দেশের বাইরে পিতামাতার আনুগত্য করাও তার জন্য বৈধ নয়। যেহেতু বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী দায়-দায়ীত্ব স্বামীর হাতেই চলে যায়। ইবনে মুফলিহ ﵀ বলেন, (وَلَا يَلْزَمُهَا طَاعَةُ أَبَوَيْهَا فِي فِرَاقٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِ، بَلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقُّ) "স্বামীর সাথে বিচ্ছিন্ন থাকা বা বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে পিতামাতা নির্দেশ দিলেও স্ত্রী তা মানতে বাধ্য নয়। বরং তার স্বামীর আনুগত্যই তার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" [ফরু']

এখন প্রশ্ন হলো, যেসব মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়াই চাকুরী করেন তাদের অবস্থা কি হতে পারে। এসব চাকুরীতে যদি পর্দাহানী ঘটে তবে তো তা এমনিতেই হারাম। আর যদি তা এমনিতে সম্পূর্ণ বৈধও হয় তবু কেবল স্বামীর নির্দেশের কারণে তা অবৈধ হয়ে যাবে।

হাম্বালী মাযহাবের ফিকাহগ্রন্থ যাদুল মুস্তানকা-এ বলা হয়েছে, (وله منعها من إجارة نفسها) “স্বামী স্ত্রীকে কর্ম (যেমন চাকুরী) করা হতে নিষেধ করতে পারে।”

শাফেয়ী মাজহাবের ফকীহ আল-মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهَا

স্বামীর এই অধিকার রয়েছে যে, সে স্ত্রীকে নিজেকে কর্ম করা থেকে নিষেধ করবে।

[হাবীল কাবীর]

মালেকী মাজহাবের ফক্বীহ আল-ক্বারাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلَيْسَ لِذَاتِ الزَّوْجِ إِجَارَةُ نَفْسِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

বিবাহিত স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া কর্ম করা বৈধ নয়। [আয-যাখীরা]

বিবাহের পর স্ত্রীকে লেখা-পড়া থেকে নিষেধ করার বিষয়টিও অনুরুপ। তবে স্ত্রীর উপর যতটুকু এলেম অর্জন করা আবশ্যক যদি স্বামী বাড়িতে তার জন্য সে ব্যবস্থা করতে না পারে তবে তা অর্জন করার জন্য সে বাইরে যেতে পারে। যেহেতু এটা তার উপর ফরজ। আর ফরজ কাজ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কারো আনুগত্য নেই।

শাফেয়ী মাজহাবের গ্রন্থ আল-গরার আল-বাহিয়্যা তে কোন বিষয়ে স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে গেলেও অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে না সে বিষয়ে বলা হয়েছে,

أَوْ اسْتِفْتَاءٍ لِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَأَرَادَتْ السُّؤَالَ عَنْهُ أَمَّا إِذَا أَرَادَتْ حُضُورَ مَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَيْهَا حَالًا أَوْ الْحُضُورَ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا

যদি স্ত্রী (স্বামীর অনুমতি ছাড়াই) প্রয়োজনিয় মাসয়ালা জানার জন্য (কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট) প্রশ্ন করতে যায় (এটা অবাধ্যতা হবে না)। তবে যদি সে তাৎক্ষনিক প্রয়োজন ছাড়াই কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্য তালীমের মজলিসে হাজির হয় বা ওয়াজ শুনতে যায় তবে এটা ওজর হিসেবে গণ্য হবে না (অর্থাৎ তা স্বামীর অবাধ্যতা বলেই গণ্য হবে)।

স্ত্রীকে পিতা-মাতার সাথে একই পরিবারে বাস করতে বাধ্য করা

বর্তমান সময়ের প্রক্ষাপটে এটি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বর্তমান সমাজের লোকেরা এই বিষয়টিকে বুযুর্গীর মাপকাঠি মনে করে। যে কোনো মূল্যে বাবা-মায়ের

সাথে একত্রে অবস্থান করা ভাল ছেলের পরিচয়। তাতে সংসারে যত সমস্যাই হোক তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এর ফলে, সমাজে নানা রকম ফিতনা ফাসাদ ঘটে। পুত্রবধু একটু শক্ত কিসিমের মহিলা হলে বউ-শাশুড়িতে তিন বেলা ঝগড়া-ফাসাদ, গালা-গালি ইত্যাদি, এমনকি চুল ছেড়াছিড়ি হয়। সমাজের দাবী তবুও সংসার আলাদা করা যাবে না। বিপরীতে পুত্রবধু যদি একটু ভদ্র ও সৎ স্বভাবের লোক হয় তবে আর দেখে কে। তার উপর চলে অত্যাচারের স্ট্রীম রোলার। যখন তখন জাত বা বংশ তুলে গালাগালি, কাজ-কর্মে দোষ ত্রুটি অন্বেষণ এবং শেষে পাড়ার লোকের কাছে নিন্দা জ্ঞাপন ইত্যাদি। এতে বউয়ের উপর তো অত্যাচার হয়ই সেই সাথে বেচারা স্বামীর উপরও জ্বালা-যন্ত্রণা কম যায় না। যে উদ্দেশ্যে বিবাহ করা সেটাই পুরণ হয় না বেচারার। রসুলুল্লাহ ﷺ জাবির ﵁ কে বলেছিলেন, (أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ) "অল্প বয়স্ক কুমারী মেয়ে বিবাহ করলে সে তোমার সাথে খেল-তামাশা করতো আর তুমিও তার সাথে খেল-তামাশা করতে"। [বুখারী ও মুসলিম] অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল প্রকার ক্রীড়া কৌতুক অহেতুক ব্যাপার কেবল তিনটি ছাড়া। তার মধ্যে রয়েছে, (وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ) "স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা করা"। [তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং হাসান বলেছেন] এছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের বেড়াতে নিয়ে যেতেন, তাদের সাথে নিয়ে রাতে হাটতে বের হতেন, স্ত্রীদের সাথে দৌড় প্রতিযোগতা করতেন ইত্যাদি অনেক শখ আহ্লাদের বিষয় হাদীসে বর্ণিত আছে। আমরা 'বৈধ প্রেম' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বস্তুত কেবল শারীরীক সম্পর্ক নয় বরং এসব শখ আহ্লাদ করার জন্যই বিবাহ করা হয়।

কিন্তু যৌথ পরিবারে থেকে বেশিরভাগ যুবকের ভাগ্যে এসব জোটে না। সারাদিন গাধার মতো খেটে আর শাশুড়ির খোটা খেয়ে স্ত্রীর শরীর থাকে ক্লান্ত, মন থাকে তিক্ত বিরক্ত। ফলে স্বামীকে সোহাগ করার মানসিকতাই থাকে না। কোনো রকমে শরীরের প্রয়োজনটা মিটিয়ে নেওয়া হয়। তাদের অন্তরে মনের শখ আহ্লাদ বা গভীর প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগই পায় না। এক সাথে বসে একটু প্রেম আলাপন, কি এক থালায় বসে খাদ্যগ্রহণ করার সুযোগ হয় না। মায়ের অত্যাচারে নব দম্পত্তি এভাবেই একই ঘরে থেকেও একে-অপরের দূরে থেকে যায়। কখনও গোপনে একটু শখ আহ্লাদ করতে গিয়ে শাশুড়ির হাতে ধরা পড়ে গিয়ে শুনতে হয় নানা কটু কথা। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে বা দিনের মধ্যে একের বেশি দুইবার গোসল করলে শাশুড়ি শোনায় মারাত্মক

অশ্লীল কথা। এত সব জ্বালা-যন্ত্রণা সত্ত্বেও কাপুরুষ স্বামী সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে না। স্ত্রীর ফরজ হক নষ্ট হওয়ার বিষয়টা নিয়ে সে ভাবে না। সে চায় কেবল সমাজ ঠেকাতে। সমাজে বদনামের ভয়ে সংসার আলাদা করতে চায় না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতটা মধুর এসব স্বামীদের বেশিরভাগই তা বুঝতে পারে না। রসুলের ঐ সকল হাদীসের অর্থও তাদের নিকট বুঝে আসে না যেখানে বলা হয়েছে, দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় উপভোগের সামগ্রী হলো নেককার স্ত্রী। বিয়ের পরপরই শাশুড়ির ভয়ংকর আচরণে এসব স্ত্রীদের মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়। বলতে গেলে ফুল ফোটার আগেই কুড়ি ঝরে পড়ে। তাই মেয়েদের কাছে কি মজার বিষয় আসে এসব স্বামীরা তা টেরও পায় না। মেয়ে মানুষ কি জিনিস তা বুঝতেও পারে না। যদি তারা নিজ স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে প্রেম নিবেদন করার সুযোগ দিতো তবেই বুঝতে রসুলুল্লাহ ﷺ কেনো তাদের দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ এবং সর্বাপেক্ষা বড় উপভোগের বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এসব স্বামীরা সত্যিতকার অর্থেই অভাগা। সমাজ ঠেকানোর জন্য এরা নিজের উপরও জুলুম করে, নিজের স্ত্রীর উপরও জুলুম করে। একারণে একাজের না দুনিয়াতে কোনো ফল পায় আর না আখিরাতে।

এদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞতার কারণে মনে করে স্ত্রীকে পিতা-মাতার সাথে এক সংসারে রাখা এবং বেধে ধরে পিতা-মাতার খেদমত করতে বাধ্য করা সন্তানের দায়িত্ব। উপরের আলোচনায় মনোনিবেশ করলে এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। যেহেতু এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিজেকে ক্ষতি করে পিতা-মাতার আনুগত্য করতে সন্তান বাধ্য নয়। তাছাড়া পিতা-মাতার আনুগত্যের নামে স্ত্রীর উপর জুলুম-নির্যাতন করাও তার জন্য বৈধ নয়। বরং এধরণের জুলুম নির্যাতন সংগঠিত হলে বা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্ত্রীকে পৃথক বাসস্থানে রাখা স্বামীর উপর দায়িত্ব। এটাই স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে একটি।

মহান আল্লাহ বলেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

তোমরা যেখানে অবস্থান করো স্ত্রীদের জন্য সেখানে বসবাসের সুযোগ করে দাও এবং তাদের কষ্ট দিয়ো না আর ক্ষতিগ্রস্থ করো না। [তালাক/৬]

এ আয়াতে তালাক প্রাপ্তা মহিলার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যতদিন সে ইদ্দত পালন

করে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা স্বামী করতে বাধ্য। এ আয়াত থেকে ওলামায়ে কিরাম প্রমাণ করেছেন, অন্ন-বস্ত্রের সাথে সাথে স্বামীর উপর স্ত্রীর নিরপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও দায়িত্ব। ইবনে কুদামা ﵀ বলেন,

فَإِذَا وَجَبَتْ السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ، فَلِلَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ أَوْلَى

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রে যখন বাসস্থান প্রযোজ্য তখন সাধারণ স্ত্রীর ক্ষেত্রে তো তা আরো বেশি প্রযোজ্য। [আল-মুগনী]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আয়াতে কেবল বাসস্থানের কথা বলা হয়নি। সেই সাথে উক্ত বাসস্থানে স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্থ করা বা তাকে কোনোভাবে কষ্ট দিতেও নিষেধ করা হয়েছে। স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিতেও এটা অনুধাবন করা যায়। যেহেতু স্বামীর উপর স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান আবশ্যক। এখন যদি কোনো স্বামী সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তিতো খাবার বা ছেঁড়া কাপড়ের ব্যবস্থা করে সেটা যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না তেমনি যে বাড়িতে স্ত্রীকে সারাক্ষণ মানসিক ও শারিরিকভাবে কষ্ট দেওয়া হয় সেখানে বসবাস করার ব্যবস্থা করাও দায়িত্বমুক্তি বলে গণ্য হবে না।

মালীকুল উলামা আল-কাসানী আল-হানাফী ﵀ বলেন,

وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَ ضَرَّتِهَا مَعَ أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ فَأَبَتْ ذَلِكَ؛ عَلَيْهِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ؛ لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا وَيَضْرُرْنَ بِهَا فِي الْمُسَاكَنَةِ وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُجَامِعَهَا وَيُعَاشِرَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ يَتَّفِقُ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ

যদি স্বামী স্ত্রীকে তার সতিনের সাথে বা স্বামীর আত্মীয়-সজন যেমন মা, বোন, অন্য পক্ষের মেয়ের সাথে একই বাসস্থানে রাখতে চায় আর স্ত্রী তা মেনে না নেই তবে স্বামীর উপর দায়িত্ব হলো, তার জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। যেহেতু এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা তাকে কষ্ট দেবে বা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সে যে থাকতে চাচ্ছে না এটাই প্রমাণ করে যে, সে কষ্ট পাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাছাড়া স্ত্রীর সাথে স্বামীর যখন তখন সহবাস করা ও অন্তরঙ্গ অবস্থায় থাকার প্রয়োজন হতে পারে ।সাথে অন্য কেউ থাকলে সেটা সম্ভব হয় না। [বাদায়িউস সানায়ি]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, স্বামী পক্ষের আত্মীয়রা স্ত্রীকে কষ্ট দিতে পারে এই আশঙ্কায় তাকে পৃথক বাসস্থানে রাখার ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে তাহলে। যেখানে কার্যত কষ্ট দেওয়া

হচ্ছে সেখানেও স্ত্রীকে ধরে বেধে একই সংসারে রাখাটা কত বড় জুলুম আশা করি বুদ্ধিমান পাঠক তা অনুধাবন করতে পারবেন।

ইবন নুজাইম ﷺ বলেন,

وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدَّارِ مِنْ أَحِمَّاءِ الزَّوْجِ مِمَّنْ يُؤْذِيهَا

শর্ত হলো, (স্ত্রীকে যে বাসায় বাস করতে দেওয়া হবে) সেখানে স্বামী পক্ষের এমন কেউ থাকবে না যে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়। [বাহরে রায়েক]

মালেকী মাজহাবের ফিকাহগ্রন্থ মাওয়াহিবুল জালিলে উল্লেখ করা হয়েছে,

قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ إِنَّ مِنْ حَقِّهَا أَنْ لَا تَسْكُنَ مَعَ ضَرَّتِهَا وَلَا مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَلَا مَعَ أَوْلَادِهِ فِي دَارٍ وَاحِدَ

ইবনে ফারহুন বলেন, স্ত্রীর হক হলো, তাকে তার সতীনের সাথে বা স্বামীর কোনো আত্মীয়-সজন বা তার অন্য পক্ষের ছেলে-মেয়েদের সাথে একই বাড়িতে বাস করতে দেওয়া হবে না।

দেখা যাচ্ছে স্বামীর পরিবার-পরিজনের সাথে আলাদা বাসস্থানে বসবাস করাটা স্ত্রীর অধিকার। এক্ষেত্রে আলাদা বাসস্থান বলতে আলাদা বাড়ি নয় বরং একই বাড়ির মধ্যে প্রাচির দিয়ে পৃথক করে নিলে এবং সেখানে পৃথক রান্নাঘর, পায়খানা ও পৃথক প্রবেশ পথের ব্যবস্থা থাকলে যথেষ্ট হবে। সেক্ষেত্রে স্ত্রী সে বাড়িতে বসবাসের ব্যপারে অস্বীকৃতি জানাতে পারে না। যদি না আসে-পাশের লোকেরা খারাপ হয় ফলে সে নিজের উপর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করে। অথবা স্বামী পক্ষের আত্মীয়রা তার সাথে সদা-সর্বদা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা করে।

বাহরুর রায়েকে বলেন,

إِنْ أَخْلَى لَهَا بَيْتًا وَجَعَلَ لَهُ مَرَافِقَ وَغَلْقًا عَلَى حِدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ بَيْتًا

যদি স্বামী স্ত্রীর জন্য পৃথক দরজা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তবে সে অন্য বাড়ির দাবী করতে পারবে না।

পরে তিনি বলেন, (لَا بُدَّ لِلْبَيْتِ مِنْ بَيْتِ الْخَلَاءِ وَمِنْ مَطْبَخٍ) "সে বাড়িতে পায়খানা ও রান্নাঘর অবশ্যই থাকতে হবে"।

তিনি আরো বলেন,

لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ أَحَبَّ، وَلَكِنْ بَيْنَ جِيرَانٍ صَالِحِينَ

স্বামী স্ত্রীকে (উপরে উল্লেখিতে সুযোগ সুবিধা সহ) যেখানে খুশি রাখতে পারে তবে তার প্রতিবেশিরা উত্তম হতে হবে।

দেখা যাচ্ছে স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের সাথে আলাদা বাসস্থানে বসবাস করা স্ত্রীর একটা অধিকার। স্বামী তাকে জোর করে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। তবে সে যদি স্বেচ্ছায় এ অধিকার ছেড়ে দেয় এবং স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন শাশুড়ি, ননদ ইত্যাদির সাথে থাকতে রাজি হয় তবে রাখা যেতে পারে। যদি না বাড়িতে দেবর, ভাসুর বা এমন কেউ থাকে যার কারণে পর্দার বিঘ্ন ঘটে। তবে যদি শাশুড়ি বা ননদ স্ত্রীকে অধিক পরিশ্রম করিয়ে নেয় বা অধিক কষ্ট দেয় আর স্ত্রী ভদ্র স্বভাব ও দ্বীনদারিত্বের কারণে সেগুলো মুখ বুজে সহ্য করতে থাকে তবে স্বামীর উচিৎ নিজ দায়িত্বে তাকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া। যেহেতু সে তার উপর দায়িত্বশীল এবং তার সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখার তার দায়িত্ব। এভাবে একদিকে স্ত্রী স্বস্তি পাবে অন্য দিকে শাশুড়ি বা ননদও জুলুম করার পাপ থেকে বাঁচতে পারবে। বলা বাহুল্য যে, এটাই প্রকৃত কল্যাণ। যে কোনো মূল্যে সংসার এক রাখার চেষ্টা করা সুবিবেচনা নয়।

উপসংহার

ইসলাম ইনসাফের ধর্ম। যার যা প্রাপ্য তা তাকে প্রদান করাই ইসলামের নির্দেশ। ব্যাক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইনসাফ কায়েম করা মুসলমানদের উপর আবশ্যিক দায়িত্ব। বলা বাহুল্য যে, পারিবারিক জীবন থেকেই এ দায়িত্বের বাস্তবায়ন শুরু হয়। মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তানদের মাঝে ইনসাফ রক্ষা করার মাধ্যমে পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে যে ব্যর্থ হয় তার মুখে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম করার কথা মানায় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এযুগের বেশিরভাগ মানুষই পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছেন না। পরিবারের সদস্যদের যার যা হক ইনসাফের সাথে তা আদায় করার পরিবর্তে কোনো এক পক্ষের ব্যপারে অতিরঞ্জন আর অন্য এক পক্ষকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তারা নিজ পরিবারে জুলুমের রাস্তা খুলে রেখেছেন। কেউ হয়তো স্ত্রীর প্রতি বেশি ঝুকে গিয়ে পিতামাতর হক বিনষ্ট করছেন আবার কেউ পিতা-মাতার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে স্ত্রীর হক বিনষ্ট করছেন। প্রথম দলটি সমাজের দৃষ্টিতেও পাপী ও

অপরাধী হিসেবে গন্য। এমনকি তারা নিজেরাও বাবা-মার খোজখবর না নিয়ে একতরফা ভাবে স্ত্রীর হক আদায় করার বিষয়টিকে মারাত্মক অন্যয় মনে করেন। তাই তাদের সম্পর্কে বিস্তারীত আলোচনা করার জরুরত নেই। কিন্তু শেষের দলটি সমাজে দ্বীনদার ও বুযুর্গ হিসেবেই গন্য। মা বাবার অধিকারের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে স্ত্রীর হক বিনষ্ট করা সত্বেও তারা লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে গর্ব করে বলে, আমরা পিতা-মাতার খেদমত করছি। এভাবে ইসলামের নামে তারা জুলুম নির্যাতনকে বৈধ করে নিচ্ছে। স্ত্রীর হক সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই সমাজের লোকও এহেনো জুলুমকে বুযুর্গীই মনে করছে। তাই এ গন্থে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর অধিকার কি এবং তা আদায় না করার পরিনাম কি সে সব বিষয়ে আলোচনা করলাম। সেই সাথে পিতা-মাতা ও স্বামীর আনুগত্যের সীমা পরিসীমা বর্ণনা করলাম। যাতে এর কোনোটিকে ব্যবহার করে স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়। এসব আলোচনার উদ্দেশ্য পিতা-মাতার অধিকারকে ছোট করে দেখা নয়। বরং পিতা-মাতার অধিকারের সাথে স্ত্রীর অধিকারের সমন্বয় সাধন করে পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করা। এই গন্থ পাঠ করে যদি কোনো ব্যক্তি তা করতে সক্ষম হন তবে আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যয় ইনসাফ বজাই রাখার তৌফিক দিন। আমিন।